গল্পগুজব

নবনীতা দেব সেন

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬১

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দীপঙ্কর চক্রবর্তী
রঞ্জন মিত্র
অনুজপ্রতিমেষু

॥ গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ ॥

'সন্ধেবেলায় কে ডেকে নেয় তারে!'

আচ্ছা, তোর মনে আছে গীতু, সেই পাঠচক্রের সেশনটা? অশোকতরুর সেই মুখ নামিয়ে গান: "ও আমার গোলাপবালা।"



এখন তো অশোকতরু অন্য ঢঙে গান করেন। আর তোর মামাবাবুর বক্তৃতা হল সে-সেশনে, স্বপ্ন বিষয়ে সেই যেরে, যেখানে আমি আমার জলের স্বপ্নটার মানে জিগেশ করেছিলুম? উনিও খুলে বলবেন না, আমিও না জেনে ছাড়ব না। এখন তো মানেটা জানি, উঃ এত হাসি পায় সেদিনকার কথা ভাবলে! মামাবাবুকে কী মুশকিলেই ফেলেছিলাম! সত্যি, গীতু তোরা যে কী করে থাকিস গদাধরপুরে! ওখানে তো আর এ রকম পাঠচক্র-টক্র হয় না। বক্তা পাবি কোথা, গাইয়েই বা কই? সভ্য-সমাজের বাইরে একটা কলেজ বসিয়েছে কী করতে কে জানে। ওখানে লাইফ বলতে তো কিছুই নেই। থিয়েটার তো নেইই, ভাল সিনেমাও নিশ্চয় যায় না, একজিবিশন কি কনসার্টের তো প্রশ্নই ওঠে না, তেমন একটা রেস্তরাঁ কিংবা দোকানপাট পর্যন্ত নেই। কী করে আছিস বল্‌তো? কী নিয়ে থাকিস? প্রেম-ট্রেমও তো হয় না। অমন মফঃস্বলের মধ্যে। সবাই নিশ্চয় চোখ পাকিয়ে আছে। একগাদা মেয়ে মাস্টার মিলে হস্টেলে থাকা, দেখিস বাবু, সাবধান, শেষটা লেসবস বানিয়ে ফেলিস না গদাধরপুরটাকে। এতো প্রায় জেলে থাকার মতনই কিনা। ফ্রীডম নেই কিছু। আচ্ছা, কী করিস রে তোরা ছুটির দিনে? কিংবা সন্ধেবেলায়? নদীর ধারটা পুরোনো হয় না? কাছাকাছি কোন প্রপার শহর আছে? গাড়ি করে ঘুরে আসা যায়? গাড়িও নেই? কেন, কলেজের স্টাফ-কারে যাবি। তাও নেই? আশ্চর্য! যেমন জায়গা, তেমনি কলেজ! কী করতে যে আছিস ওই অজ পাড়াগাঁয়। কী করেই বা আছিস ওই অজ গাঁয়ে, চিরকাল শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় বাস করে? বোরিং লাগে না? বিয়েটিয়ের তো নামও করিস না। লাগিয়ে দিই একটা সম্বন্ধ? আমার এক ভাশুর ফিরেছেন বিদেশ থেকে, একটু বয়স্থা এডুকেটেড মেয়ে চান, নিজেও বহুকাল অ্যাকাডেমিক লাইনেই ছিলেন। তোর সঙ্গে বেশ মানাবে। না মশাই অত মুচকি হাসির কিছুই নেই। বত্রিশ তো পার হলে, এরপর আর কবে বিয়েটা করবে শুনি? চিরটাকাল কেবল গেঁয়ো গাধাগুলোকে পিটিয়ে গোরু বানালেই চলবে? গদাধরপুরে মানুষ থাকে! ওটা কি একটা লাইফ হল গীতু?

লাইফটা কী রকম বদলে গেল গ্যাখ! একসঙ্গে পড়তে পড়তে কত স্বপ্ন, কত প্ল্যান—তারপরে আমি শ্বশুরবাড়ি, আর তুই গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ। কোথায় গেল লেখক হওয়া, কোথায় গেল নাটক করার স্বপ্ন। একদিক থেকে দেখলে অবশ্য তুই মন্দ নেই। বেশ ঝাড়া হাত পা। আমি? এটা ভাল থাকা হল? ঘরসংসার ছেলেপুলে নিয়ে গ্যাতা জোবড়া হয়েই কাটল দশটা বছর। একদম গবেট হয়ে গেছি। কে বলবে একদিন ডিবেটিং চ্যাম্পিয়ান ছিলুম। এখন যা কিছু ডিবেট সব আয়া বাবুর্চির সঙ্গে। কর্তা? হুঁ, তা হ'লেই হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার দেখাটা হচ্ছে কোথায়, যে ডিবেট করব? তিনি তো এই অফিস, এই ফ্যাক্টরি, এই ট্যুরে যাওয়া, অমুক পার্টিকে মীট করতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে লাঞ্চ, তমুক পার্টিকে মীট করতে স্যাটারডে ক্লাবে ডিনার—এই কম্মই করে বেড়াচ্ছেন দশ বছর নন্‌স্টপ। বউয়ের সঙ্গে বসে বসে ডিবেট করবার মতন তাঁর অত সময় নেই ভাই। দিনরাত ছুটোছুটি। একটু যদি বিশ্রাম পান,—তো সে ক্লাবে। বউয়ের আঁচল ধরা হলে কেউ জীবনে উন্নতি করে না, বুঝলে? কেন আমার জন্যে তো আয়া আছে ড্রাইভার আছে খানসামা আছে মালী বাবুর্চি ঠাকুর চাকরের ঘোর বৃন্দাবন একেবারে! আবার একটি কর্তাও চাই? সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? একেই তো আমার বলে কত ফ্রীডম! যখন খুশি বেরোও, যেখানে খুশি যাও, যা খুশি কেনাকাটা করো, শ্বশুর শাশুড়ি-দেওর-ননদ কেউ ঘাড়ে নেই, যে-যার সে-তার। সবরকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে, হাই সোসাইটির কনেকশনস্ রয়েছে, কত নেমন্তন্ন, কত পার্টি। আমার মুখে নালিশ শোভা পায় না ভাই। পায়? তুইই বল্! ব্যাপারটা কি জানিস, ছোটবেলায় পড়েছিলি না, দোয়াত আছে, কালি নেই? আমার সংসারটা হচ্ছে ঠিক তাই। হাসছিস? ছাই বর্তে যেতে তুমি আমার জীবন পেলে। জানিস না তাই বলচিস। সেই চিরাচরিত গল্প আর কি—এ সকল ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বউদের হয় কোনো প্রেমিক যোগাড় করে পালিয়ে যাওয়া, নয়তো ভায়ে-টায়ে কিংবা ড্রাইভার-টাইভারের সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম করা।

গল্পের বইতে তাই করে। যারা এসব কম্ম পারে না, তারা চার ইঞ্চি ঝুলের জামা পরে ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত তুলে লেসের রুমালে নাক চেপে হপ্তায় একদিন বন্যত্রাণে কিংবা কুষ্ঠাশ্রমে বেড়াতে যায়, আর বাকী ছ'দিন ধরে তারই জন্যে দু'বেলা মিটিংবাজী করে পার্ক হোটেলে। আর বাকীরা হয় দুপুরবেলা ক্লাবে গিয়ে অন্য গিন্নিদের সঙ্গে তাস খেলে আর জিন্ খায়, নয়ত আমার মতন খুঁজে খুঁজে পুরোনো বন্ধুদের বের করে, তুতিয়ে পাতিয়ে আড্ডা দিয়ে সময় ভরাতে চায়। আজকাল অবশ্য 'বুটীক' খোলার একটা রেওয়াজ হয়েছে, উপরি রোজগারও, সময়টাও কাটে।

—সময় যে আর ফুরোতে চায় না। বাচ্চারা তিনজনেই দার্জিলিঙের ইশকুলে আছে। এখানে কি রেগুলার পড়াশুনো হয়? আজ বন্ধ্, কাল স্ট্রাইক! ওইখানে থাকলে ডিস্টার্বেন্স হবে না। তাছাড়া উনি বলেন হস্টেলে থাকলে নিজেরটা নিজে করতে শিখবে! আমি যে এদিকে কী করি। গান? হ্যাঁ, আবার একটু আধটু ধরেছি ওটা—একটা স্পেশাল ক্লাসে জয়েন করেছি। নারে, পিয়ানোটা ছেড়েই দিয়েছি। ওটা তো কোনো দিনই তেমন ভালো লাগতো না। কেবল চালিয়াতির জন্যে শেখা ভালোবেসে আর স্কুলে পিয়ানো নেয় ক'জন? তোর সেতারের কথাটা একদম আলাদা। সেতার হ'ল তোর প্রাণ। তাও কি আর এতদিন থাকতো, যদি বিয়ে-থা করে সংসার পেতে বসতিস? নেহাত বনে বাদাড়ে পড়ে আছিস, আর একা একাটি আছিস, তাই এখনও সেতারটা বজায় রাখতে পেরেছিস। ভাগ্যিস তোর রেডিও প্রোগ্রামগুলো থাকে, তাই তো তবু কলকাতায় আসিস। নইলে কে আর পারতো বলো গদাধরপুরে গিয়ে গিয়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ টিকিয়ে রাখতে? অমন একটা গডফরসেক্ন প্লেস! রেডিও? অ্যাবসার্ড কথা বলিস না। আমি গাইব কি? আমার গান কি লোকসমাজে বের করবার মতন? ওই সময় কাটাতে নিজের মনের যা একটু গুনগুন করা। তোমার সেতারের সঙ্গে তার তুলনা হয়? আমি তো ভাই কোনোদিনই অরিন্দমদের মতন গাইতে পারতুম না!

আচ্ছা, তোর অরিন্দমের কথা মনে পড়ে, গীতু ? সত্যি কী গলাই ছিল ছেলেটার, না রে ? এখন তো আর রেডিওতে প্রোগ্রাম করে না। অত বড় পোস্টে কাজ করছে আই, টি, সি,তে ব্যুরোক্র্যাট হয়ে গেছে। পুরোপুরি বক্সওয়ালা বড়সায়েব। আমার কর্তা যেমন। অথচ দ্যাখ অরিন্দমের চেয়ে কত নিরেস গাইতেন উমাদি, অরিন্দম যখন এ ক্লাস আর্টিস্ট, উমাদি তখন বি-তে। চর্চার গুণে সেই উমাদিরও এল. পি. বেরিয়ে গেল।

গানের লাইনটাই যে ছেড়ে দিল অরিন্দম। জুনিয়র এক্সিকিউটিভ পরীক্ষায় অত ভালো রেজাল্ট করল কিনা। এখন তো তিনি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ। ভালো চাকরিটা পেয়েই মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল ওর। হাসচিস তুই ? ভালো চাকরি পেলে বুঝি লোকেদের ক্ষতি হয় না ? খুব হয়। কত যে ক্ষতি হয়, তা যার ভালো চাকরি নেই, সে কখনো বুঝবে না। বেকারী যেমন, বড়ো চাকরিও তেমনি। কী করে যে মানুষকে নষ্ট করে ফ্যালে তা তো দেখতে পাও না। সে অন্যরকম সর্বনাশ। অরিন্দম যদি ওই চাকরিটা না পেতো, আমি ঠিক জানি এখন মস্তো বড়ো গাইয়ে হোতো। কোনটা বেশী ভালো হোতো ভাব্ ?

—গীতু, তোর মনে আছে, সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে উমাদি আর অরিন্দমের গান—"সোনার হরিণ চাই ?" অপূর্ব হয়েছিল। না ?

অরিন্দমের "চিরসখা" তোর মনে পড়ে না গীতু ? উমাদির বোধহয় অরিন্দমের প্রতি একটা উইকনেস ছিলো—উমাদির সেই "বন্ধু রহো রহো সাথে" আমি কোনো দিনই ভুলবো না। আমাদের সেই হেঁটে হেঁটে ফেরা, সায়েন্স কলেজ থেকে অরিন্দমকে তুলে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায়, বালিগঞ্জের ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, পাঠচক্রের রিহার্সালের পরে ? মনে পড়ে গীতু ? কী করে হাঁটতুম রে অত ? চৌরঙ্গীতে এসে, ট্রাম ধরে শ্যামবাজার। এখন তো একদম হাঁটতেই পারি না। তুই এখনও পারিস ? তুই যে রোগা আছিস। তাই। আচ্ছা, আমরা দুজনেই অরিন্দমের গান অতো ভালোবাসতুম অথচ কোনো হিংসেহিংসি তো

ছিল না ? রেজাল্ট বেরুনোর পরে গঙ্গার ধারে সেই সন্ধেটা মনে পড়ে ? অরিন্দমের "আমার এ-পথ" গাওয়া, আর তোর-আমার কান্না ? মনে পড়ে, তোর কী রাগ আমার ওপরে, অরিন্দমকে যখন আমি 'না' বললুম ? আচ্ছা, তুই অতো ক্ষেপে গেলি কেন বল্‌তো ? কী আশ্চর্য একটা বন্ধুতা হয়েছিল আমাদের তিনজনের। বেচারা উমাদি আমাদের তিনজনকেই হিংসে করতেন ! উঃ ! আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন ? অন্তত দুশোবার তো তোকে বলেছি কেন অরিন্দমকে 'না' বললুম। তোমার অত ইচ্ছে ছিল তো তুমি নিজেই কেন বিয়ে করলে না বাপু তাকে ? বাঃ, আমাদের 'জুড়ি মিলে ছিল' না ছাই। তোর ওটা একটা ফিক্সেশন। এই দশ বছর বাদেও একই কথা বলবি ? কেন ওকে বিয়ে করলুম না ?—কেন আবার। আমার ব্যারিস্টার বাবাটি অমন কেরাণী বাপের গাইয়ে-ছেলেকে পাত্র বলেই মানতেন না,—আমাদের সঙ্গে ওদের বাড়ির অবস্থা মিলতো না। আমি একভাবে মানুষ, ওরা অন্য-ভাবে। তখনও তো আর ঐ পরীক্ষাটা দেয়নি ও। কী করে জানবো বল্ যে দুটো বছর যেতে-না-যেতেই অরিন্দমের এতখানি অবস্থা পালটাবে ? যখন ও চাকরিটা পেলো, ততদিনে তো আমার বিয়ে হয়েই গেছে। অরিন্দম কিন্তু মাত্র গেল বছরে বিয়ে করল। দিল্লীতে। পাঞ্জাবি বউ। শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী। তুই দেখেচিস ? না, আমিও দেখিনি। অরিন্দমকেই দেখিনি। সেই আমার বিয়ের রাত্তিরেই শেষ সাক্ষাৎ ! ও কখনো আমাদের বাড়িতে আসেনি। আমার কর্তাকে তো মীটই করেনি ! করলে অবশ্য জমত ভাল। কথাটা কি জানিস ? ও যদি গানই ছেড়ে দিল, তাহলে ওকে বিয়ে করলেই বা কী তফাতটা হত ? এই একই হত। আমার কর্তারও যেমনি, অরিন্দমেরও নির্ঘাত তেমনি—অফিস, ফ্যাক্টরি, লাঞ্চ, ডিনার, ট্যুর প্রোগ্রাম, ক্লাব, কক্‌টেল ! দেখতিস ঠিক সেই একই লাইফ হত আমার। বরং কষ্ট আরেকটু বাড়তো। কেবলই মনে হত: গান ছিল, গান নেই ! একটা ব্যুরোক্রাটের সঙ্গে আরেকটার তফাত একখানা কাস্টম-মেড মার্সিডিজ গাড়ির সঙ্গে আরেকখানার যা—অর্থাৎ শূন্য ; নিল্।

—ধেৎ সম্মান করব না কেন? নিজের স্বামী বলে কথা! সম্মান-টম্মান সবই করি তবে কি জানিস, ওদের ওই জান-প্রাণ দিয়ে কেরিয়ার গড়াটাতে কেমন যেন ঘেন্না ধরে গেছে ভাই। ওদের এয়ার কনডিশনড অফিসের চেয়ার টেবিলগুলো যেমন ফ্যাশনেবল আর কমফরটেব্‌ল, ওদের লাইফগুলোও তাই—আর লোকগুলোও সব একজাতের।

একটাকে চিনলেই সবগুলোকে চেনা হয়ে যায়। যাই তো ক্লাবে। সবক'টা এক! সব ছাঁচে-ঢালা মানুষ রে। অরিন্দমের চাকরিটাও তো ঐ ছাঁচের, সেও অমনিই হয়ে গেছে নিশ্চয়। এই আমার কর্তার মতই। গান-টান তো আর কোথাওই গাইতে শুনি না। ওর বউটার জীবনও আর দশ বছর বাদে ঠিক এই শ্রীমতীর মতই হবে, তাকেও কলেজ ফ্রেন্‌ডদের খুঁজতে বেরুতে হবে দেখিস। হ্যাঁ, তা যা বলেছিস! যদি দশ বছর টেকে! আজকাল তো এই রকমই হাল হয়েছে। এদের এই সোসাইটিটাই তেমনি! রুনুর লাইফটা কী হয়ে গেল ছাখ্‌। সত্যি ভারি স্যাড। জয়ন্তী আবার বিয়ে করে ফেলেছে, এখন মিসেস স্নেহেরা হয়েছে। রুনুটা ও রকম পারবে বলে মনে হয় না। ও বি. এ. পড়তে ভর্তি হয়েছে শুনলুম!

হ্যাঁরে গীতু, তোদের ওখানে ফিলসফিতে কোনো ভেকেন্সি নেই! আমি কিন্তু ইণ্টারেস্টেড। বাচ্চাদের তো দার্জিলিঙে পাঠিয়েছি, এখন আমার কাছে আলিপুরও যা, গদাধরপুরও তাই। এটা কি একটা লাইফ হল? হয় ভীষণ হেক্‌টিক্‌, আর নয়তো বোরিং! বরং তোদের ওখানটাই বেশি রিফ্রেশিং হবে। আমার বায়োডাটা তো তুই জানিস গীতু। সত্যি একটু খোঁজ নিবি, গিয়েই? 'সিরিয়াসলি বলচি।' কি আশ্চর্য, হাসচিস? ওহ্‌, কর্তার কথা ছাড়। তাঁর বেয়ারা বাবুর্চি সবাই আছে। আমি তো একটা ফাউ। কর্তা বোধহয় টেরও পাবেন না মেমসাহেব কলকাতা মে, ইয়া গদাধরপুর মে! একমাত্র পার্টি দেবার সময়ে ছাড়া। বাজে কথা রাখ। আরেকটু কফি নে। এটা নতুন পারকোলেটর—ভাল কফি বানায়, না?

ফ্রান্সের এক সাহেব দিয়েছেন কর্তাকে। শোন্, সত্যি রে, ফিলসফিতে একটা চান্স হয় না তোদের গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে? কি বললি? ওখানে বড় মশা? টিকতে পারব না?—তুইও আমাকে ঠাট্টা করছিস, গীতু?

॥ মিরাক্ল ॥

ফরতে ফিরতে দশটা বেজে গেল। সকলের আগে দুটো ফোন করতে হবে। ফেরবামাত্র। একটা খোকনের বাড়িতে, ওর দাদু ঠাকুমাকে জানিয়ে দিতে হবে যে খোকন আজ বাড়ি ফিরবে না।



বাপি, খোকন দু'জনেই হাসপাতালে রাত কাটাবে; বাচ্চুকে হসপিটালে রিমুভ করতে হয়েছে। বাচ্চুর অবস্থা ভাল নয়, লোক চিনছে না, দারুণ রাইগর হচ্ছে। ডাক্তারবাবু বাড়িতে রাখতে ভরসা পেলেন না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে মেজ জামাইবাবুর থ্রু দিয়ে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলুম এইমাত্র। বাচ্চু বাপিদের সঙ্গে পড়ে, হোস্টেলে থাকে। জ্বর বাড়তে বাপি ওকে এবাড়িতে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এখানে রাখলে চলবে না। ডাক্তারবাবু ভয় পাচ্ছেন। জেনারেল ওয়ার্ডে রেখেও শান্তি নেই। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করানোর চেষ্টা করছেন। খোকনের দাদুকে ফোনটা করে দিয়েই ভক্তিব্রত মেসোমশাইকে ফোন করতে হবে। অত বড় ডাক্তার ভক্তিব্রত মেসো নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করতে পারবেন। হার্টের অবস্থা নাকি অস্বাভাবিক, প্রেশার অবিশ্বাস্য নিচে নেমে গেছে। বাপির বন্ধু, বয়স কত আর? ওই উনিশ-কুড়িই হবে। অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাবার সময়ে পাল্‌স ছিল না। বাচ্চুর আবার কলকাতায় কেউ নেই। লোকাল গার্জেন এক জামাইবাবু, তিনি নামেই লোকাল; থাকেন বিরাটিতে। আর মাসের মধ্যে পঁচিশ দিনই কাটান ট্যুরে। দিদিটি গিন্নিবান্নি গাঁইয়া মানুষ। খবর শুনে কেবল কেঁদেই ভাসাচ্ছেন!— জামাইবাবু এখন ট্যুরে। সবটা দায়িত্বই বন্ধুদের ঘাড়ে পড়েছে। তারাও তো ছেলেমানুষ। দেখি, ভক্তি মেসোকেই ধরতে হবে। রাত দশটার পরেই সেটা সুবিধে। আমিও তো খুব একটা এক্সপার্ট কেউকেটা নই, চাকুরে-মেয়ে বলে খানিকটা হালু চালু, এই পর্যন্ত। ঠিক এই সময়টায় পাঁচদিনের জন্যে দুর্গাপুরে পাঠিয়েছে ওঁকে,—কী যে করি! খোকনের বাবা-মাও আপাতত দিল্লিতে, বাড়িতে কেবল বুড়োবুড়ি—দাদুঠাকুমা। খোকনের বাড়িতে ফোন করতে চেষ্টা শুরু করি—ওঁরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন। খবরটা না দিলেই নয় যে নাতি আজ রাত্রে ফিরবে না।

ডায়ালের চেষ্টা করতেই বুঝলাম লাইনে জট। তোলবা মাত্রই এক ভদ্রলোক বললেন,—"কোরয়েট সিক্সয়েট জিরো টু থ্রি?" আমি

বললুম—"না। রং নাম্বার। ছেড়ে দিন।" নামিয়ে রেখে আবার তুলে ডায়াল করি। আবার—"ফোরয়েট সিক্সয়েট স্যরি, ফোরসিক্সয়েট সিকস জিরো টু ত্রি ?"

মনে অসহ্য উদ্বেগ তায় এই ইনডিসাইসিভ অ্যাপ্রোচ টু লাইফ অ্যাণ্ড ফোন নাম্বার্স—ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে যায় আমার। বললুম—"আগে মনস্থির করুন তো দেখি ? ঠিক নম্বরটা বেছে নিন। আসলে কোন্‌টা চান ?" বলেই খেয়াল হোলো, ভদ্রলোক সাতটা ফিগার বলছেন। ফোন নম্বরে সাতটা সংখ্যা তো হতেই পারে না। স্বগতোক্তি করে ফেলি,—"সাতটা ফিগার বলছে—পাগল নাকি ?" গুরুগম্ভীর আরেকটা তৃতীয় গলা এবার ফোনের মধ্যে গুমগুম করে ওঠে—"ছেড়ে দিন দিদিমণি পাগল নয় ও ম্যাড্রাসী মাতালের কাণ্ড।"

—আজ্ঞে কী বললেন ?

—বলচি—ওসব ম্যাড্রাসী মাতাল। ওদের কিচু জ্ঞানগম্যি আচে ? বিশমিনিট ধরে এই চালাচ্চে। একেকটা নম্বর। আপনি তো এই মাত্তর লাইনে এয়েচেন।

আসামের সাম্প্রতিক কীর্তিকলাপের কল্যাণে আমি এখন দারুণ সর্বভারতীয়। উদার জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ প্রাণী। প্রচণ্ড ভীতি জন্মেছে, বুকের মধ্যে টের পেয়েছি প্রাদেশিকতা মহাপাপ। কোমর বেঁধে লেগে পড়ি—এই মদ্রদ্বেষীকে শায়েস্তা করা দরকার।

—কেন, বাঙালী মাতালদের বুঝি জ্ঞানগম্যি থাকে ? তারা মাদ্রাজী মাতালদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীর জীব ?"

—আঃ হা কী মুশকিল ! সব মাতালই যাচ্ছেতাই, সব মাতালই পাবলিক ন্যুইসেন্স। কি বাঙালী কি ম্যাড্রাসী। তবে ম্যাড্রাসী মাতাল আরো খারাপ। গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করেন তিনি। আমিও খেপে যাই।—

—'কেন ? কেন ? শুনি ?'

—কেন না ইদিগে তারা মাছ মাংস খাবে না, অথচ উদিগে মদ খাবে—ধাতে সইবে কেন ? নিরিমিষ্যি সাত্ত্বিক আহারের সঙ্গে ওসব

রাজসিক পানীয় চলে না, বুইলেন ? কতায় বলে 'মদ্যমাংস' ! মদ্য সইতে হলে মাংস চাই, প্রোটিন চাই—গায়ে বল চাই !

এই রে, সাত্ত্বিক-রাজসিক কী সব লজিক্যাল ইনকনসিস্টেন্সি দেখাচ্ছে ! কিন্তু মূল বিষয় যখন প্রাদেশিকতার গন্ধযুক্ত, তখন যুক্তি মানেই দুর্যুক্তি। অ্যাবসার্ড অথবা সাউণ্ড—কোনো প্রকার যুক্তিতেই প্রাদেশিকতাকে সাপোর্ট করা যায় না। অতএব ইতিহাস থেকে উদাহরণ খুঁজতে থাকি, কোথায় ভেজিটেরিয়ানরা বলশালী ছিল ?—ডাইনোসর ?—বৌদ্ধরাজারা ?—হিটলার !

—কেন মশাই, হিটলার তো নিরিমিষ্যি খেত, সে কি শক্তিমান ছিল না ?

—না। সে ছেলো অত্যোচারী। বলবান হওয়া আলাদা জিনিস। তাছাড়া সে ব্যাটা মদও খেত না। তাছাড়া সে ম্যাড্রাসীও ছেলো না, ছেলো কি ?

—মাদ্রাজী এত অপছন্দ কেন আপনার ?

—কে বলেচে ? মাড্রাসী ভাড়াটের মতন ভাড়াটে হয় না। ম্যাড্রাসী বসের মতন বস্ হয় না। তাছাড়া, ইলেকশন থেকেও তো বুইতে পাচ্চেন, ম্যাড্রাসের হাতেই ইনডিয়ার ফিউচার, ওরা সব টক দই খেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ক্লিয়ার ব্রেনে কারেক্ট পলিটিকাল পয়েন্টগুলো দেকতে পায়। বুয়েচেন ? সাধে কি আমাদের ম্যাড্রাসী প্রেসিডেণ্ট, ম্যাড্রাসী বিদেশমন্ত্রী, ম্যাড্রাসী অর্থমন্ত্রী ?

—কিন্তু ওঁরা সবাই তো ম্যাড্রাসী নন, দুজন অন্ধ্রের লোক।

—ওই একই হোলো। দ্রাবিড় কালচার। বিন্ধ্যের ওপার। ম্যাড্রাসী মানে কি ম্যাড্রাসের লোক ? ম্যাড্রাসী মানে সাউথ ইনডিয়ান। ইডলি-ধোসাকে কী বলবেন ? ম্যাড্রাসী খাবার। সেটা কি কেবল ম্যাড্রাসেই খায় ? না হোল সাউথ ইণ্ডিয়া ?

—হাল্লো, সিকসয়েট ফোরয়েট—স্যরি,—ত্রিয়েট ফোরয়েট সিকস জিরো টু ?—দ্বিধা-জড়িত প্রশ্ন আসে। অমনি ধমক !

—আঃ। এগেন ডিস্টার্বিং ? পুট ডাউন রিসিভার। গো টু বেড।

স্লীপ! গিভিং অল রং নাম্বার্স আনডারস্ট্যাণ্ড? নো সেভেন ফিগার নাম্বার ইন ক্যালকাটা। প্লিজ ডিসকানেক্ট। যত্তো সব ইয়ে—হুঁঃ।"

—য়োক্কে য়োক্কে, স্যরি টু ডিস্টার্ব ইউ স্যার, গুড য়িভিনিং ট্রুয়্যায়ল—সবিনয়ে ফোন নামানোর শব্দ হয়। —আমিও সগৌরবে ঘোষণা করি—

—দেখলেন কত ভদ্র? দ্রাবিড় কালচার বাংলার চেয়ে ঢের উন্নত কালচার।

—ওই এক মিনিট! এক্ষুনি আবার তুলবে। মাতালের আবার কালচার। হুঁঃ।

হঠাৎ আমার খেয়াল হয় ফোনটা তো করা হচ্ছে না খোকনের দাত্বকে? একি কাণ্ড; আমিও কি মাতাল? ব্যাকুল হয়ে বলে উঠি—

—আপনিও এবারে ফোনটা প্লীজ একটু নামিয়ে রাখুন, আমাকে খুব জরুরী একটা কল করতে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে।

—আমারও খুব জরুরী। আপনিই নাবিয়ে রাখুন। আমি লাইনে এইচি আপনার ঢের আগে।

—প্লীজ! আমি তু' মিনিটে সেরে নেব?

—মেয়েছেলের ফোন তু'মিনিটে সারা হবে? হাঁসালেন।

—এটা সেরকম ফোন নয়। একটি ছেলেকে এইমাত্র হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছি। সেই সম্পর্কে খবর দিতে হবে—সত্যি সত্যি ভীষণ আর্জেন্ট—বিশ্বাস করুন—আমার গলা আটকে যায়।

—ঠিক আচে ঠিক আচে বুজিচি বুজিচি—খটাশ করে ফোন ছাড়ার শব্দ হয়। আঃ বেশ ভদ্রলোক তো? এই তো ডায়ালটোন! সযত্নে খোকনদের নম্বরটি ঘোরাই।

—হ্যাল্লো!—সেই গুম গুম আওয়াজ।

—আঃ! আপনি কেন ধরলেন?

—ধরলুম কেন? আমার ফোন রিং করচে বলে।—

—ওঃ—ছাড়ুন, ছাড়ুন, আপনি না ছাড়লে—

—ছাড়চি। ছাড়চি। আমি কি ইচ্ছে করে বাগড়া দিইচি নাকি? ভালো ঝঞ্ঝাটেই পড়িচি বাপু। নিন মোশাই করুন আপনার ফোন!

ঝনাৎ করে রিসিভার নামানোর শব্দ হয়। আবার ডায়ালটোন। খোকনের নম্বর ঘোরাই। দু'বার রিং করতেই—

—হ্যাল্লো।

—ফোর টু টুটু থ্রি টু?

—এখনো পাননি বুজি?

—অ্যাঁ? আবার আপনি? ধুত্তোর ছাই—

—এ লাইন দুটো জড়িয়ে গ্যাচে মনে হচ্চে—ওটা আপনি আজ আর পাবেন না বোদায়।—

—পাই না-পাই আপনাকে ভাবতে হবে না! আপনি আগে নামিয়ে রাখুন তো?—বিনাবাক্যে ওদিকে শব্দ হয়—কট্রাস। ডায়াল-টোন। ডায়াল করি—

—হ্যাল্লো—একটা সুদূর শব্দ আসে এবার।

—হ্যালো, খোকনের দাদু বলছেন? দাদু, নমস্কার। আমি বাপির বউদি। আমাকে চিনতে পারছেন তো?

—নমস্কার। তা আর পাচ্চিনি? খুব পাচ্চি চিনতে। রাগ করবেন না যেন বউদিদি, আমি—ইন্‌অ্যাডভারট্যান্টলি—

—অ্যাঁ? আবার আপনি? এখনো লাইনে আছেন?

—মোটেই নেই। ফোন বেজেচে, রিসিভ করিচি। আর বলতে হবে না, ছেড়ে দিচ্চি।

—শুনুন, শুনুন, এবারে বাজলেও রিসিভ করবেন না।

—তা কখনো হয়? আমি রিসেপশনিস্ট। ফোন ধরা ফোন করাই আমার কাজ।

—এই রাত সোয়া দশটার সময়ে কোন আপিসে রিসেপশনিস্ট বসে থাকে, জানতে ইচ্ছে করে?

—কোনো আপিসেই নয়। আপিসগুলো বেলা পাঁচটার পরে মহাশ্মশান।—

—তাহলে ?

—আমি তো হোটেলে চাগরি করি। আটাশবছর ধরে এই হোটেলে চাগরি কচ্চি। নাইট ডিউটি। মানে টেন-টুসিক্স ফুলশয্যে। অথবা কণ্টক শয্যে। যাই বলুন।

—অ! তা দয়া করে খানিকক্ষণ অন্তত ফোন ধরবেন না। আমি খবরটা দিয়ে নিই ? খুব আর্জেন্ট।

—না ধরলিই বা কী ? বাজচে তো এখেনে। খোকনের দাদুর বাড়িতে তো যাচ্চেই না। বুয়েচেন ? জট পাকিয়ে গ্যাচে লাইনে। কী খপরটা কী ?

—আর বলবেন না একটি ছেলেকে হাসপাতালে—

—ভর্তি করে এয়েচেন। তা তো শুনলুম। কেসটা কী ? মিনিবাস ?

—না না। ভীষণ জ্বর বিকার—এনকেফালাইটিসের আশঙ্কা—

—সেই খবরটা খোকনের দাদুকে দিতে হবে ? যে আপনারা খোকনকে হাসপাতালে ভত্তি করে এয়েচেন ?—

—না না, খোকনকে নয়। বালাই ষাট। বাচ্চুকে। কিন্তু খোকন আজ রাত্তিরে ফিরবে না, ওরা সব বন্ধুরা মিলে হাসপাতালে রাত জাগবে —সে খবরটা না দিলে বুড়োবুড়ি দাদু ঠাকুমার তো উদ্বেগেই—

—অ! বাচ্চুকে! কিন্তু আজগে ফোনে তো পাবেন না! বাড়িতে খবর দিয়ে আসার মতন কেউ নেই ?

—কোথায় আর ? উনি দুর্গাপুরে গেছেন অফিসের কাজে, দেওর তো নিজেও হাসপাতালে রাত জাগছে। আছি কেবল ননদ আর আমি।

—আই সী!

একমুহূর্ত গম্ভীর নৈঃশব্দ্য। তারপর—

—খোকনের বাড়িটা কোতায় ?

—যোধপুর পার্কে। অনেক দূর।

—আপনি ঠিকানাটা দিন দিকিনি। খবরটা যদি পৌঁচে দেয়া যায়, দেকি চেষ্টা করে।

—আপনি দেবেন ? আপনি এখন কোথায় ?

—শ্যালদায়। এ হোটেলটা শ্যালদা ইস্টিশনের কাচে।

—পাগল নাকি ? কোথায় শেয়ালদা কোথায় যোধপুর পার্ক ! এত রাত্তিরে !—

—রাত বেশি হয়নি তো, স' দশটা মোটে। ট্রাম বাস চলচে। দেকি কোনো ছোঁড়া ফোঁড়াকে পয়সা দিয়ে যদি পাঠাতে পারি—দিন ঠিকানাটা দিন—

—না না ওসব পাগলামি ছাড়ুন। আমি বরং দেখি সামনের বাড়ি থেকে যদি ফোন করা যায় ! আমাকে তো আরো গোটা দুই মেসেজ দিতে হবে কি না ?

—কি ? রিলাই কত্তে পাচ্চেন না। না ?

—না না, তা কেন ? আপনার কাইনড অফারের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। সত্যি বলছি। দেখি, যদি—না পেরে উঠি তখন হয়তো···

সামনের বাড়ির কাকাবাবু-কাকীমা খুব ভাল লোক। প্রায় শুয়ে পড়ছিলেন, ভাগ্যিস আরো দেরি করিনি ? যাক্ একবারেই লাইন মিলে গেল। খোকনের দাদু ঠাকুমা সত্যিই খুব ভাবনায় পড়েছিলেন। একটা ডিউটি চুকলো। নেক্সট ভক্তিব্রত মেসোমশাই। তাকেও পাওয়া গেল এক ডাকেই। সব শুনে বললেন—"দাঁড়া, দেখি যদি দাশগুপ্তকে পাই, নইলে মণ্ডলকে ধরতে হবে। আমি একটু পরেই ফোন করে তোকে জানিয়ে দেব কদ্দূর কি পারা গেল।" ফোন ছেড়ে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরলুম। ফিরেই মনে পড়লো—"ফোন করে জানিয়ে দেব" মানে ? ফোন তো নষ্ট। ফোন তো জটপাকানো। শেয়ালদার সেই হোটেলের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা ! ওদিকে সামনের বাড়ির আলো নিবে গেছে। আবার গিয়ে বুড়োমানুষদের তুলে বিরক্ত করা যায় না। কাকীমা অসুস্থ মানুষ। এখন কী করি ?

এদিকে আমাদের ফোনে তো সমানেই নানাবিধ অশরীরী শব্দ—দেয়ালাকরা শিশুর অধোফোটা হাসিকান্নার মতো—আধো আধো ক্রিরিরিং···রি রি রিং···হচ্ছে তো হচ্ছেই। হঠাৎ লক্ষ্য করলুম

তিনবার করে বাজছে। আশ্চর্য তো, বাজা উচিত ছ-বার করে। ছোট ননদ রিংকুটা সদ্য কলেজে ঢুকেছে, অঙ্কের পোকা, চটপটে বুদ্ধি খেলে মাথায়, বললে—"ও বৌদি, নির্ঘাৎ সেই ভদ্রলোক ওয়াননাইন নাইন ঘোরাচ্ছেন এবার।—দেখই না ফোনটা তুলে।"

ফোন তুলতেই—হ্যালো, ট্রাংকবুকিং?

—আজ্ঞে না।

—তবে? ওয়ান নাইন নাইন?

—আজ্ঞে তাও না। আমাকে চিনলেন না? আমি সেই যে বাপির বউদি।

—ওঃ হো, আর আমি সেই শ্যালদার—

—আজ্ঞে বুঝেছি।

—আপনি কি পারলেন যোধপুর পার্কে খবরটা দিতে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হয়ে গেছে। সামনের বাড়ি থেকে। থ্যাংকিউ।

—যাক বাঁচা গেল! এবার ছেড়ে দিন।

—আপনি এতরাত্তিরে কোথায় ট্রাংক বুকিং করছেন?

—আর বলেন কেন? হোটেলের চাগরি। বুক কচ্চি একটা ডিল্লির কল।

—ও বাবা। দিল্লি? তাহলে আর ভদ্রতাটা রেসিপ্রোকেট করা গেল না! স্যরি।

—তার মানে?

—মানে, আপনি তো যোধপুর পার্কে গিয়ে আমার মেসেজটা দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন? আমি কিন্তু তার রিটার্ন দিতে দিল্লি গিয়ে আপনার মেসেজটা পৌঁছে দিতে পারছি না! এই আরকি!

গম্ভীর গলায় সীরিয়াস উত্তর হয়—না না, তা কী করে হবে। সে তো সম্ভবই নয়। তারচে, আপনি বরঞ্চ ফোনটা ছেড়ে দিন। তাহলেই হবে। এখন রিং শুনলেও ধরবেন না কিচুক্ষণ।

—তা কেমন করে হবে? আমি যে একটা ডাক্তারের কল এক্সপেক্ট করছি? ছটা টুংটাং বাজলেই আমি ধরব। তিনটে বাজছে

শুনলে বরং আর ধরব না। আপনি চেষ্টা করুন। —বলে আমি রেখে দি।

—টুং-টাং-টিং, ক্রিং-ক্রাং ক্রিং চলতেই থাকে। যেন আধোঘুমে-আধোজাগরণে নিশি-যাপন করছে টেলিফোন। আমরাও ঘুমোতে পারি না। রিংকু আর আমি খাটে শুয়ে জেগে থাকি, ওই বকম্বাজ ডিলিরিয়াস ফোনের পাশে। কী জানি, যদি ফোনটা এসে যায়? হঠাৎ রিংকুর মস্তিষ্কে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল।

—বৌদি, এক কাজ করলে হয় না?

ভক্তি মেসো যতবারই ফোনের চেষ্টা করবেন, প্রত্যেকবার তো শেয়ালদার ওই ভদ্রলোককেই পাবেন? ওই নম্বরেই যাবে নিশ্চয়ই আমাদের সব ফোন। ওদের কলগুলো ফোন এখানে বাজছে। ওকেই বলনা কেন, "রং নাম্বার" বলে নামিয়ে না রেখে, বরং আমাদের মেসেজটা নিয়ে রাখতে?

—আইডিয়াটা মন্দ নয়। খাসা। কিন্তু একজিকিউট করবি কেমন করে? ভদ্দল্লোককে পাবো কোথায়?

—কেন? ট্রাংকবুকিং ঘোরাও? এই তো তিনটে করে রিং হচ্ছে। ঠিক কনেকশন হয়ে যাবে। গেরো বাঁধা আছে না?—

ননদিনীগর্বে বুকটা ক্যাশিয়াস ক্লে-র মত চওড়া বোধ করতে থাকি। ডিরেকটারি খুলে ট্রাংক বুকিং নম্বর খুঁজে, সেইটে ঘোরাই।

—হ্যালো?

হ্যালো—ট্রাংক বুকিং? গম্ভীর প্রশ্ন হয়।

—আজ্ঞে না। আমিই বলছিলুম, ঐ যে, বাপির বৌদি—

—বুজিচি! এখন আবার কাকে ফোন কচ্চেন?

—আপনাকেই খুঁজছিলুম আর কি!

—অ্যাঃ? রীতিমত ভয়ের ছাপ ফোটে গলায়।

—মানে ডাক্তারের সেই কলটা তো পাচ্ছি না, তাই ভাবছিলুম আপনাকে একটা কথা বলে রাখি—

—অ। তাই! কণ্ঠস্বরে স্পষ্টত রিলিফ।—বলুন, কী বলচেন?

—আচ্ছা, থ্রি ফাইভ ফোর সিক্স জিরো থ্রিতে কোনো ফোন যদি আপনার লাইনে আসে—

হ্যাঁ-হ্যাঁ এয়েছেল তো ? ঐ নম্বরে এক ভদ্দল্লোক দুতিন— .

—ঐ ! ঐ ! ঐ হচ্ছেন ভক্তি মেসোমশাই, উনিই তো জানবেন ছেলেটাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি করা গেল কিনা ! ওই ফোনের জন্যেই আমরা বসে আছি।

—কিন্তু লাইন তো জড়িয়ে গ্যাচে ! কল তো আপনি পাবেন না ?

—সেই তো মুশকিল। তাই জন্যেই আপনাকে একটা অনুরোধ করব ভাবছি—

—বলুন !—অসামান্য ভদ্র শব্দ হয়।

—ফের যদি থ্রি-ফাইভ-ফোর সিক্স জিরো থ্রি-তে কোনো কল আসে, দয়া করে রং নম্বর বলে নামিয়ে রাখবেন না।

—কিন্তু ওটা তো আমাদের নম্বর নয়।

—জানি ! জানি ! কিন্তু ওইটেইতো আমাদের নম্বর ? ফের যদি ফোন আসে, আপনিই দয়া করে একটু মেসেজটা নিয়ে রাখবেন ? ডক্টর ভক্তিব্রত ভট্টাচার্য, ডিরেকটর হেলথ সার্ভিসেস ফোন করবেন।

—ওঃ হো। তাই নাকি ? কি সৌভাগ্য !

—আমাদের মেসোমশাই হন ! বেশ গর্ব ফোটে গলায়।

—বা ! বা ! বেশ ! বেশ !

—উনি যদি বুলটিকে চান,—

—আপনার নাম বুলটি ?

—ঐ ডাকনাম আর কি, বুলা থেকে—

—আমার ভাইপোর নামও বুলু। বি-কম পড়চে।

—ওমা ? তাই নাকি ? বেশ মজা তো ? বুলা, বুলু একই। তা, যা বলছিলুম, ভক্তিব্রত মেসোমশাই যদি—

—কিন্তু উনি আমাকে মেসেজটা দেবেন কেন ? আমার লোকাস স্ট্যানডাই-টা কী ? হু অ্যাম আই ?

—লোকাস স্ট্যানডাই ? সেসব থাকগে। এইভাবে তো কাজটা হতে পারে ? আপনি কি ডক্টর বি. বি. ভট্টাচায্যি ? ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস ? বুলটিদের লাইনটা জড়িয়ে গেছে—আমাকেই মেসেজটা নিয়ে রাখতে বলেছে। বাচ্চু কেমন আছে ? ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি হল কিনা ?

—বা—চ—চু কে—ম—ন আ—ছে। ই—ন—টেন—সিব হোলড অন প্লীজ কে—য়া—রে—

—ও কী ? আপনি কী করছেন ?

টেকিং ডাউন ইওর মেসেজ ম্যাডাম। হ-ল—কিনা। ব্যস। এটাই তো রিসেপশানিস্টের কাজ। সারাক্ষণ তো এই কম্মোই কচ্চি। মেসেজ রাখা, আর মেসেজ দেওয়া। কল বুক করা আর কানেকশন দেওয়া। হ্যালো আর হোল্ড অন।

—ওঃ হো। স্যরি, আপনার দিল্লির বুকিংটা···

—ট্রাংকবুকিং ধরলে তো ? নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্চে সব।

—তারা ধরবে কেমন করে ? বাজছে তো আমাদের বাড়িতে তারা তো জানেই না আপনি ডাকছেন।

—তাও তো বটে ! ওঃ।

যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। সব্বোধ্বংসী মহাকালের কুনজরে পড়িচি মোশাই, দিদিমণি—সব ভেঙ্গে পড়চে। পুরো কোলকাতা শহরটা চতুর্দিক থেকে ব্রেকডাউন কচ্চে। যেমনি রাস্তাঘাটের অবস্তা তেমনি ট্রাম-বাসের অবস্তা, তেমনি তেল চিনি ক্যারাসিন তেলের অবস্তা। যেমনি আমাদের হাসপাতাল, তেমনি ইলেকট্রিক সাপ্লাই, তেমনি আমাদের জলের ব্যাবস্তা, রাস্তায় তো জঞ্জালের কাঁড়ি, এমন ক, গঙ্গানদীটা পজ্জন্ত নাকি বুঁজে যাচ্চে শুনিচি। কী সব্বোনেশে কতা ! মহাপাপের ফল। বুয়েচেন ? একটা জাত অনেক পাপ কল্লে তবেই তাদের অমনটা হয়। একেবারে শেষ হয়ে যাবার আগে সভ্যতার এমনি অবস্তা হয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর বলি : তা যা বলেছেন। সত্যিই,

জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে কলকাতাতে। উম···আচ্ছা, আবার বলি? যদি থ্রি ফাইভ ফোর সিকস জিরো থ্রিতে কেউ—

—ফোন করে, তবে মেসেজটা রেকে নোবো। থ্রি— ফাইভ— ফোর— সিকস— জিরো—থ্রি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন···

—মেসোমশাইয়ের নাম ভক্তিব্রত ভট্টাচার্য্যি, ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস······

—ভ-ক্তি-ব্র-ত—মেসোমশাই···এই তো? ঠিক আচে। যিনি ফোন করুন, মেসেজ নিয়ে নোবো। আমি তো বসিই রইচি। কিন্তু আপনাকে খবরটা ফের দোবো ক্যামন কোরে?

—কেন? ওয়ান নাইন নাইন? ট্রাংক-বুকিং? ফায়ার? অ্যাম্বুলেন্স? হাওড়া স্টেশন? যা খুশি ঘোরাবেন। যাই ডায়াল করুন আমাকেই তো পাবেন!

—তা বটে। যাচ্ছেতাই। যাচ্ছেতাই। হোল সিস্টেমটা ব্রেকডাউন কচ্চে মোশাই—দিদিমণি। এখন যদি একটা কোনো এমারজেন্সি হয়—

—যদি মানে? আমার তো এমারজেন্সিই—

—সত্যি! কী কাণ্ড। শালাদের—স্যরি—

—যাক গে ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই, রেখে দিচ্ছি। গুড নাইট—

—গুড নাইট দিদিমণি, আমার অবিশ্যি এখন গুডনাইট নয় গুড আফটারনুন বলতে পারেন—টেন পি এম টু সিকস এ এম যখন ওয়ার্কিং ডে—

—সত্যি কী কষ্ট আপনার।

—কষ্ট আর কি! চাগরি। অব্যেস হয়ে গ্যাচে।

আপনি শুয়ে পড়ুন।

—কোনো খবর এলে আমি দিয়ে দোবো।

ঘণ্টাখানেক তন্দ্রা এসেছিল—আবার ফোনে তিনটি ট্রি-রি-রিং বাজতে লাগলো। অস্ফুট ইঙ্গিতের মতো। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড হাইজাম্প করে।

—হ্যালো!

—হ্যালো!

—ওঃ আপনি? পেলেন দিল্লি?

—ডিল্লি? নাঃ চেষ্টা কচ্চি। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু! বুইলেন? কিন্তু আপনারটা এয়েছেল।

—এসছিল? ভক্তিব্রত মেসোমশাই—

—আচ্ছে হ্যাঁ। রুগী ভালই আচে। ইনটেনসিব কেয়ারে ভর্ত্তি হয়ে গ্যাচে। ডাক্তার দাশগুপ্ত নিজে গে দেকে এয়েচেন এই রাত্তিরেই—তিনি বলেচেন রুগীর বয়েস কম, স্বাস্থ্য ভালো, দিব্যি ফাইট কচ্চে, ওষুদে অলরেডি রেসপনড করেচে—

—আপনাকে যে সত্যি, মানে কী যে বলব—

—আগে সবটা শুনে নিন, ধানাই পানাইটা পরে হবে। ডক্টর ভটচায্যি মনে কচ্চেন সারভাইভ্যালের চান্স ভালই, তা সত্ত্বেও রুগীর আত্মীয়স্বজনদের খপর দিয়ে দেয়া উচিত—ওরা ভাবচে লক্ষণটা মেনিনজাইটিসের,—এখনো প্যাথলজিক্যাল টেস্টগুলো অবিশ্যি হয়নি, নেক-রিজিডিটি আছে, তাছাড়া ডিলিরিয়াসও—রুগীর বাপ-মাকে ইমিজিয়েটলি খবর দিতে বলেচেন।

—বাপ মা তো গৌহাটিতে।

—ট্রাঙ্ককল করুন। ফোন আচে?

—জানি না। কিন্তু ঠিকানা জানি।

—আর ফোন থাকলেই বা কি। এই ডিল্লির মতনই হবে। ফোনের যা অবস্তা! টেলিগ্রাম করুন।

—টেলিগ্রাম? এত রাত্তিরে কোথায় বেরুবো? দুটো বাজে বোধ হয়—কাল সকালে করতে হবে।

—সকালের চেয়ে রাতেই তাড়াতাড়ি যাবে। দেরি করবেন না। দিন দিকি ঠিকানাটা? আর মেসেজটা দিয়ে দিন। আমি পাঠিয়ে দিচ্চি টেলিগ্রাম।

—আপনিই বা এত রাত্তিরে—ডেস্কের ডিউটি ছেড়ে—

—আমি যাবো ক্যানো ? হোটেলের ছোঁড়াগুলো রয়েচে কী কত্তে ? এইখেনেই ফর্ম রয়েচে—আর পাশেই টেলিগ্রাম আপিশ—হোলনাইট ওপেন। দিন, দিন, ঠিকানা আর মেসেজটা—কী লিকবেন ? আগে তাদের নাম ঠিকানাটা বলুন—ফর্মটা বের করি দাঁড়ান। হ্যাঁ, রেডি। এইবার বলুন ?···কই ?···বলুন ?···

—বলব ?

—বলবেন না তো কি আমি হাত গুনবো ? ছেলেটার বাপের নাম কি ?

—সত্যেন বড়ুয়া !

—থাকে কোতায় ?

—প্রফেসর্স কোয়ার্টার নম্বর ফাইভ, গৌহাটি ইউনির্ভাসিটি, গৌহাটি।

—বড়ুয়া ? অসমীয়া ? এখানে আচে যে বড় ?

—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে।

—তার বেলায় বাঙ্গালী বুজি বদ নয় ? হুঁঃ। —হুঁঃ। যত্তো সব পলিটিকসের বদমাইসি আসলে।

—হ্যাঁ। সাধারণ মানুষ তো রাজনীতিকের হাতের পুতুল।

—বলুন, কী লিকবেন এইবার ? ঠিকানা লিকে নিইচি। আর্জেন্ট করবেন কিন্তু। নইলে যাবেই না। আসামে যে তাণ্ডব চলেচে। আর্জেন্ট কল্লেও যায় কিনা দেকুন। কলকাতার টেলিগ্রাম তো ?

হ্যাঁ হ্যাঁ আর্জেন্টই করুন। নিশ্চয়ই। এ আর বলতে ?

—ছেলেটার নাম কী ?

—বাচ্চু।

—তবে লিকুন—বাচ্চু সীরিয়াসলি ইল—হসপিটালাইজড—কাম ইমিজিয়েটলি—তলায় নাম কী দেবেন ?

—বাপি-ই দিয়ে দিন। আমার দেওর ওদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল গৌহাটিতে। ওঁরা চিনবেন।

—শুনুন, শুনে নিন ভাল করে, আবার পড়চি : আর্জেন্ট

টেলিগ্রাম। সত্যেন বড়ুয়া, প্রফেসার্স কোয়ার্টার নম্বর ফাইভ, গৌহাটি ইউনিভার্সিটি গৌহাটি। বাচ্চু সিরিয়াসলি ইল হসপিটালাইজড কাম ইমিজিয়েটলি। বাপি। এই ত?

—বাঃ খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু টাকাটা তো দেওয়া যাবে না?

—ওটা পরে হবেখনে। এটার খচ্চা বেশি নয়। কত আর গোটা দশেকের মধ্যিই হয়ে যাবে। আরো কম হবে। এখন নিচে নাম ঠিকানা দিতে হবে। কী লিকব? সেনডারস নেম অ্যাণ্ড অ্যাড্রেস!

—কিন্তু টাকাটা—

—পরে হবে। অত ভাবনার কিচু নেই। নাম ঠিকানাটা আগে দিন। টাকাটা পরে কখনো ওই ড্যাওরের হাত দে পাটিয়ে দিলিই চলবে। বলুন, কী দোবো নাম ঠিকানা? অবিশ্যি ফোন নম্বরটা দিলেও হয়! বাপি, কেয়ার অব কী লিখব?

—কেয়ার অব এন কে দত্ত, থ্রি ফাইভ ফোর সিকস জিরো থ্রি।

—এ-ন-কে-দত্ত—থ্রি-ফাইব···

—এবার আপনারটা বলুন?

—বলচি। লিকে নিন। খাতা পেনসিল আচে?

—আছে।

—বেশ। লিকুন—জি পি চন্দর, জ্ঞানপ্রকাশ চন্দর, থ্রি ফাইব ফোর টু এইট ওয়ান।

—হয়েছে? জি পি চন্দর, থ্রি ফাইব···হুঁ। হয়েছে। এবার ঠিকানা?

—ঠিকানা? চাগরির ঠিকানাটাই ঠিকানা। দিনের বেলায় মেস। রাত্তির বেলায় আপিশ। ও আপনি অতো বুজবেন না। বুজেও কাজ নেই। লিকুন, হোটেল শ্রীনিবাস—

—হোটেল শ্রীনিবাস···

—হোটেল শ্রীনিবাসটা হচ্চে হ্যারিসন রোডের ওপরিই, প্রায় শ্যালদার অপোজিটে—তিনতলা বাড়ি। সদ্য গোলাপী টালি লাগিয়েচে

একতলার ভেতর সাইডে, বাইরের ভ্যালেও। আপনার ভ্যাওর ঠিক খুঁজে পাবে। আপনি এবারে একটু শুয়ে পড়ুন দিকিনি? এভাবে সারারাত্তির উদ্বেগের মদ্দে! আপনার টেলিগ্রাম আমি এক্ষুনি করিয়ে দিচ্চি।

—টাকাটা আমি বাপিকে দিয়ে কালই নিশ্চয়—হাসপাতালও তো ওই কাছেই—

—হবে, হবে। ছেলেটা ভগবানের দয়ায় বেঁচে উঠুক তো আগে? বিদেশ বিভুঁয়ে—

—আপনাকে কী যে বলবো মানে···আপনার মতো মানুষ··· আজকের দিনে এমন মানুষ সত্যিই···মানে

গম্ভীর গলায় মৃদু হাস্য করেন জি পি চন্দর। এই প্রথম হাসি।

—এইটুকুনি তো মানুষ মানুষের জন্যে করবেই।

—এটুকু করবেই মানে? কেউ করে? কেউই করে না। সরে বসে একটু জায়গা পর্যন্ত করে দেয় না কেউ অন্যের জন্যে।

দেয়, দেয়। হোটেলে কাজ কত্তে কত্তে চুল পেকে গেল দিদিমণি মানুষ কি কম দেকিচি? মন্দও যেমন দেকিচি, ভালোও তেমনিই দেকিচি। এটুকুনি মানুষ মানুষের জন্যে করেই থাকে। আপনি কচ্চেন না? ভ্যাওরের বন্ধুর জন্যে? এবারে ছেড়ে দিন দিকিনি? একটু শুয়ে পড়ুন।

—ঘুম হবে কি? হাসপাতালের খবর-টবর আসে যদি?

—সে এলে তখন উটবেন। এলে তো আসবে এখেনে। ধরবো তো আমিই। আপনি শুয়ে পড়ুন গে।

—থ্যাংকিউ মিস্টার চন্দর···আপনাকে কী যে বলব।

—কিছুই বলতে হবে না বুলটি দিদিমণি থ্রি ফাইভ ফোর টু এইট ওয়ানটুকু মনে রাকবেন, কোনো দরকার হলে মোটে সঙ্কোচ করবেন না। ইউ আর লাইক মাই ডটার, শুদ্ধু একটা ফোন করে দেবেন। লাইনের জটটা খুলে গেলে তো আর এ রকম ডিরেক্ট সার্ভিস পাবেন না?

পরদিন সকালে বাপি যখন ফিরল, অসম্ভব উত্তেজিত। মুখ-চোখ লাল।

—বাচ্চু কেমন আছে?

—আগের চেয়ে ভালো। প্রেশারটা স্টেবিলাইজ করে গেছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে বৌদি। একেই বোধ হয় মিরাকল বলে, এই সকাল সাড়ে ছটা সাতটা নাগাদ, একজন বুড়োমত লোক, ধুতি-শার্ট পরা, সব চুল সাদা। এসে বাচ্চু বড়ুয়ার বন্ধুদের খোঁজ করল,—একেবারে বাপি, খোকন নাম ধরে! তারপর আমার হাতে এই স্লিপটা দিয়ে—বলতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার বৌদি—এই স্লিপটা দিয়ে বলল—'বড়ুয়াকে টেলিগ্রাম করা হয়ে গেছে। এটা তার রসিদ্। তোমার বৌদিদিকে দিও।' মানে আমরা তো···একেবারে স্টান্ড। স্পেলবাউনড! বিফোর উই কুড রিকভার ফ্রম দ্যাট ভেজড স্টেট হি ডিসাপিয়ার্ড। হাওয়া হয়ে গেল বৌদি। জাস্ট মিলিয়ে গেল। আর দেখতেই পেলুম না। কে লোকটা? কী করে জানল বাচ্চুর কথা? আমাদের কথা? আমাদের নাম? তোমার কথা? কে? কে পাঠালো টেলিগ্রাম? রিয়্যালি বৌদি, টু, থিংক অফ ইট···ও কি, তুমি হাসছো? জাস্ট লুক অ্যাট দিস চিট—অ্যাকচুয়ালি গেছে টেলিগ্রাম দেখেছো তো? বাট হু ওয়াজ হি? নোবডি নোজ হিম···সত্যিই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বৌদি, এই দ্যাখো—

বাপি মুঠো করে আস্তিন-গোটানো পেশী-বহুল হাতটা সামনে এগিয়ে দ্যায় লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। আমি আর হাসি না।

এমনি সময়ে খোকনের ফোন এলো। তার মানে লাইনের জট খুলেছে। খোকনও অসম্ভব উত্তেজিত।

—'শুনেছেন তো? বাপি বলেছে সব? কী স্ট্রেনজ একসপিরিয়েন্স ······ভাবলেই গা শিরশির করে উঠছে, সত্যি বৌদি দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ! দাদু তো শুনে বলছেন আর ভাবনা নেই তোদের বন্ধু এযাত্রা বেঁচে গেল—আমি অবশ্য অতটা

বলছি না, তবে ব্যাপারটা সত্যিই মিরাকুলাস। একেই বোধ হয় বলে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি মিরাক্ল। না বৌদি? আচ্ছা, রিসীটটা আপনি হাতে নিয়ে দেখেছেন? ইটস আ রিয়্যাল রিসীট!

ক্যান ইউ বিলিভ ইট? এমন যে হতে পারে—উত্তেজনায় খোকনের বাক্যি হরে যায়।

ভাগ্যিস রিংকুটা মর্নিং কলেজে বেরিয়ে গেছে? ফিরলেই বারণ করে দিতে হবে। জি পি চন্দরের কথাটা ছেলেদের কাছে কোনো দিনই ভাঙ্গা চলবে না।

ওরা বড় দরিদ্র। বিশ্বাস বস্তুটির স্বাদ ওরা মোটেই পায় না। তার সুযোগই আসে না বেচারাদের জীবনে। এটুকু পেয়েছে, আহা জমা থাকুক। সত্যিই তো মিরাকুলাস ঘটনা মিস্টার জি পি চন্দর।

স্লিপটা যত্ন করে তুলে রাখি। শেয়ালদার অপোজিটে, গোলাপী টালি, হোটেল শ্রীনিবাসে নিজেকেই দেখছি যেতে হবে টাকাটা ফেরত দিতে।

জোবান সুঁজাক

"বাপ্‌রে বাপ্! আবার প্রেজেন্ট? নিজেকে ফিরিয়ে এনেছি এই যথেষ্ট"—দাদামণি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে চুরুটে দেশলাইতে মন দেন। বৌদি ছাড়বার পাত্রী?

"ছি ছি ছি লোকে বলবে কি? জাপানে ঘুরে এলে বারোদিন—একটা মাত্তর জাপানী পুতুল ছাড়া কিছু আনলে না? নাইলন শাড়ী ইলেকট্রনিক ঘড়ি ক্যালকুলেটার, ক্যাসেট রেকর্ডার, ক্যামেরা টিভি—লোকে কত কি আনে, নিদেনপক্ষে মুক্তোটুক্তো—কিছু না?"

"সব টাকা যে জোবানে চলে গেল।"

"তার মানে? জুয়ো খেলেছিলে নাকি?

"দূর। জুয়ো খেলব কেন? ট্রাডিশনের জন্যে মূল্য দিতে হবে না? ট্রাডিশনের মূল্য দিতে গিয়ে কেবল কি ধনেই মরেছি? প্রাণেও মরছিলুম আরেকটু হলে।" চুরুট থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বৌদির মুখখানা আবছা করে দেবার চেষ্টা করেন দাদামণি। কিন্তু বৌদির মুখ অত সহজে আব্‌ছা হবার নয়।

"প্রাণসংশয় হওয়া অতই সোজা? বললেই হলো? ধনসংশয়টাই সহজ, আর তোমার সেটা চব্বিশঘণ্টাই হচ্ছে।" গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরা এখানে কথায় যোগ দিয়ে ফেললুম।—"সত্যি? বল, দাদামণি, বল না, কী হয়েছিল?

"তোরাও যেমন! তোদের দাদামণি বলুক, আর তোরাই শোন। আমার ওসব ঢের শোনা আছে। যত গুল্‌তাপ্পি বানাবে—"

—"না গো না, গুল নয়। তানাবেকে তো মনে আছে? সেই যে এসেছিল সেবারে, খৈতানের সঙ্গে?

"সেই নাকচ্যাপ্টা জাপানীটা? যে আমাকে অত সুন্দর পাখাটা দিয়ে গেল?

"হ্যাঁ সেই তানাবে। অত সুন্দর পাখা দিল, তবু তাকে নাকচ্যাপ্টা বলছ ?"

"না তো কি শুকনাসা বলতে হবে ?"

"সেই তানাবে ছিল সঙ্গে। গুল্ কিনা, তাকেই জিজ্ঞেস কোরো। আবার আসছে সে, জানুয়ারিতে।'

বৌদি এবারে একটু নরম হন।

"কী হয়েছিল কী, শুনি ?" তাচ্ছিল্য ভরে বললেও বোঝা যায় ভেতরে উদ্বেগ রয়েছে।

"কী হয়নি, তাই বরং জিজ্ঞেস করো। জোবান আর সুজিকি। জোবান আর সুজিকি আমাকে ধনেপ্রাণে শেষ করে দিচ্ছিল। আরেকটু হলেই। বড্ড বেঁচে গেছি। তোমারই ঠাকুরের দয়ায়। রোজ অত ফল-বাতাসা খাওয়ানোর একটা প্রতিদান তো আছে ?"

বৌদি এবার বেশ নরম। খাটের একপাশে বসে পড়েন। আমরা তো আগেই খাটে গুছিয়ে বসেছি। দাদামণি সুরু করেন।

"তোরা তো জানিস্ তোদের বৌদি কী কিপ্টে। ওর ছেলেবেলার সেই ক্যামেরাটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, ছবি তুলে আনতে। কেননা, ওটা দিয়ে ছবি তোলা খুব সোজা। প্রথমেই হল কি, সেইটে গেল হারিয়ে।"

"অ্যাঁ" বৌদি চেঁচিয়ে ওঠেন—"সেটা হারিয়ে এসেছো ? আমার বাবা দিয়েছিলেন চোদ্দবছরের জন্মদিনে—" কান্নায় গলা বুজে আসে বৌদির। আঁচল চোখে উঠে যায়।—দাদামণি ব্যাকুল—"আহা শোনোই না, এসে গেছে ক্যামেরা তোমার। হারিয়েছিল—পাওয়া গেছে। হয়েছে ?—"

"তাই বল ? এবার বল কী করে হারাল ?" বৌদির চোখে জল মুখে হাসি।

"তানাবেকে তো চেনো। কিন্তু তোশিওকে চেনো না। তোশিও-নো বিখ্যাত পণ্ডিত, সেও আসবে জানুয়ারির সেমিনারে। তখন দেখবে। তাদের দুজনের সঙ্গে যাচ্ছিলুম ইউয়াকি শহরে। পথে

পড়ে কাজিওয়াতা। তোশিও-নোর ছেলেবেলার বাসা। সেখানে প্রচুর সামুরাই পরিবার বাস করে। মধ্যযুগীয় শহর। জাপানী ট্রাডিশনের খনি। তোশিও ভয়ানক ট্রাডিশন পাগ্‌লা লোক, সেই আমার প্রধান গার্জেন ছিল ওখানে। সে আর তানাবে। ভাল ইংরিজি বলে, আমার দেখাশুনোর ভার তাদের ওপরেই ছিল। আমাদের সেমিনার চার দিনেই শেষ। তারপর টোকিও ছেড়ে চললুম



উত্তর-পূর্ব জাপানের এই শহর ইউয়াকিতে। সেখানে একহপ্তার নেমন্তন্ন। কিন্তু তাদের কলেজ তখন বন্ধ। তাই তোশিও আর তানাবে ঠিক করেছিল আমাকে ক'দিন কেবল জাপান দেখাবে। জাপানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করাবে।"—দাদামণি ধোঁয়া ছাড়লেন।

"প্রথমটা। কাজিওয়াতা। নেমে দেখি হাতে ক্যামেরা নেই। সীটে রেখে এসেছি। এদিকে ট্রেন তো সুপারসনিক গতিতে উধাও। স্টেশনমাস্টারের ঘরে গেলুম। তানাবের সঙ্গে। সে বিশাল এক খাতা বের করে লিখতে লাগল— নাম? ঠিকানা? বয়স? পাসপোর্ট নম্বর?—

"আমি তো হারাইনি, আমার ডিটেলে কী হবে?"—নিয়ম। ক্যামেরার নাম? বয়স? নম্বর? কটা ফিল্ম এক্সপোজ্‌ড হয়েছে?"

সর্বনাশ। কুড়িটা, না উনিশটা; কিছুতেই মনে পড়ে না। কিন্তু ওটা জরুরী। ক্যামেরার বর্ণনা শুনে তানাবে বললে—"ওটা বরং ফেলে দাও। ও দিয়ে কী হবে? কত ভাল ভাল ক্যামেরা বেরিয়েছে, কিনে দেব তোমায়।"

"ও বাবা! আমার বউয়ের ক্যামেরা—"

"বউকে তুমি ভয় পাও?" অবাক চোখে তাকিয়ে তানাবে বলল।

"তুমি পাও না?"—তানাবে উত্তর না দিয়ে বলে—"একথাটা তোশিও-নোর সামনে খবর্দার যেন বোলো না। তুমি কি জানো ও কেন গাড়ি চালায় না?"

"কেন? লাইসেন্স নেই বলে?"

"ডানহাত নাড়তে হবে বলে।"

"ডানহাত নাড়তে ওর অসুবিধা আছে?"

"নেই? ওরা খাস সামুরাই যে! ওর ঠাকুর্দা ঠাকুমা দাদামশাই দিদিমা চারজনেই সামুরাই বংশীয়। তাই।"

"তাই মানে?"

"সামুরাইদের ডানহাত চালানো মানেইতো তরওয়াল চালানো! এও জানো না?"

"তাই তো। তা তুমি তো গাড়ি চালাও।"

"আমি চালাবোনা কেন? আমার তো কেবল দিদিমা সামুরাই বংশীয়া। বাকী সবাই চাষী। আমি দুহাত নাড়তে পারব না কেন?"

সত্যিই তো। চমৎকার লজিক।—"দুজনে তো একসঙ্গেই পড়াশুনো করেছ, একসঙ্গেই চাকরি করছ, অথচ তোমাদের মধ্যে এত তফাত?"

"তফাত থাকবেনা? এটা তো ট্রাডিশনের কথা। ও সামুরাই। আমি কৃষক। এখন যদিও বেতন একই পাচ্ছি—তাতে ট্রাডিশন তো বদলায় না। ওটা হাজার বছরের ব্যাপার।" একটু থেমে তানাবে বলল—"তোশিওর বউ টোকিওয় কেন থাকে, জানো?"

"টোকিওতে থাকেন বুঝি? কেন?"

"কেননা তোশিও যখন ইউয়াকিতে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করল, ওর বউ বলেছিল—"তার মানে, টোকিও ছেড়ে চলে যেতে হবে?" ব্যাস। সেই থেকে তোশিওর বউ টোকিওতে, আর তোশিও ইউয়াকিতে। বউ পায়ে ধরেছিল, তবুও তোশিও ওকে সঙ্গে নেয়নি। এত স্পর্ধা, স্বামীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ইচ্ছে প্রকাশ করে? সেই শেষ। দশবছর তোশিও ইউয়াকিতে একা থাকে। বউ অনেকবার আসতে চেয়েছে—কিন্তু স্বামীর সেই এক কথা। "থাকো তুমি তোমার টোকিওয়।" ওকে যেন তুমি বোলো না তোমার বউয়ের ক্যামেরার জন্যে তুমি এমন করছ।"

তোশিওর পাণ্ডিত্যের প্রতি আগেই আমার সম্ভ্রম ছিল, এখন তো আরো বেড়ে গেল। সত্যি, পুরুষসিংহ একেই বলে। এমন না হলে স্বামী? শৌর্য বীর্য আছে, হ্যাঁ! সামুরাইয়ের রক্তই বটে। ঝাড়া ৪৫ মিনিট ধরে ক্যামেরার আইডেনটিফিকেশনের ব্যবস্থা হল। ইউয়াকি স্টেশনে খবর দেওয়া হবে। সেখানে প্রমাণ দাখিল করলে ক্যামেরা মিলতে পারে।

কাজিওয়াতা শহরের লোকেরা খুবই দুঃখিত, সেখানে মার্কিনরা বোমা ফেলতে ভুলে গেছে বলে। বোমা না-পড়ার দরুন, ওদের দারুণ ক্ষতি

হয়ে গেছে। মহামুশকিলে পড়েছে তারা—অন্য সব শহরের দিব্যি উন্নতি হচ্ছে, ওদের বেলায় কচু। না রিমডেলিং না রেনোভেশন, না রিকনস্ট্রাকশন নট কিচ্ছু। কোনো রকমের ডিভেলপমেণ্ট প্ল্যানিং নেই। ফলে সামুরাই ঐতিহ্য ঘুণ পোকার মত কাজিওয়াতার ইটে-কাঠে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যের হাত থেকে রেহাই নেই শহরবাসীর। —তোশিও অবশ্য এতে খুবই খুশি, তাকে তো আর এখানে থাকতে হয় না।—

তানাবের কথা থেকে যা বুঝলুম, তার সারমর্ম এই।

মুরাসাকি একবর্ণ ইংরিজি জানে না। সে হচ্ছে তোশিওর সম্পর্কে ভাই, তারাও ভগ্নাংশ-সামুরাই। কাজিওয়াতা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে সে-ই তার গাড়িতে। দিনের শেষে, মুরাসাকি জাপানীতে কিছু একটা বললো। যা শুনে তোশিও তানাবে দ্বৈত কোরাসে গেয়ে উঠলো—"জোবান ?" এবং দুজনেরই মুখ স্বর্গীয় উদ্ভাসে আলোকিত হয়ে উঠল। তোশিও বললে—"চলো, চলো, চাকলাবাকলাতি, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। মুরাসাকি আজ আমাদের একটা অসামান্য জিনিস দেখাবে। দারুণ ট্রাডিশনাল। জোবান !"

"সেটা আবার কী ?"

"স্পা !"

শহর থেকে বেশ দূরে। পাহাড়ের ঢালুতে, ছোটো সাদা দোতলা বাড়ি। গাড়ি থামতেই, এক রুক্ষমূর্তি জাপানী কোত্থেকে উদয় হয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

"ওকি ? ওকি ? গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে কেন ?"

"ও ঠিক আছে। পার্কিং করছে।" তানাবে সান্ত্বনা দেয়, "এটা একটা বড় হোটেল। চলো ভিতরে যাই।"

দোতলা বাড়িতে ঢুকতেই দুটি সিল্কের কিমোনোপরা সুন্দরী মেয়ে এসে একশোবার কোমর ভাঁজ করে নত, নম্র, বিনয়ী ভাবে, বিনা অনুমতিতে আমাদের পা থেকে জুতো মোজাগুলো কেড়ে নিয়ে অন্য একরকম মোজা আর ঘাসের চটি পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাক—গাড়ি গেছে, এবার জুতোগুলোও গেল। কোথায় যে পার্কিং হতে

চলে গেল কে জানে? এরা দেখছি একবার এলে আর ফেরবার পথ রাখে না। একশোকুড়ি টাকা দামের জুতোটি খুইয়ে, এই ঘাসের চটি পরে কলকাতায় ফিরলে, তোমাদের বৌদি আমাকে আর আস্ত রাখবে না। একেই তো ক্যামেরা গেছে! মনটা ভারী হয়ে রইল।

মেয়েদের সঙ্গে মুরাসাকির কথাবার্তা সব জাপানীতে হচ্ছে। তোশিও-তানাবে এসে বললে—"চল সব ঠিক হয়ে গেছে।" সঙ্গে একটি জাপানী মেয়ে এল পথ দেখাতে। আমরা গিয়ে লিফ্‌টে চড়লুম। লিফ্‌ট উঠছে তো উঠছে। স্পষ্ট দেখেছি ছোটমতন সাদামতন দোতলা বাড়িটায় ঢুকলুম, পাহাড়ের গায়ে—আর এই লিফ্‌ট তো উঠল সোজা পাঁচতলা। আশ্চর্য কাণ্ড। নেমে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে যেতে লাগলুম আমরা, আগে আগে কিমোনোপরা মেয়েটি তুর্ তুর্ করে খরগোশের মত পায়ে হাঁটছে। টানেলে বিজলীবাতি ফিট্ করা। টানেল দিয়ে বেরিয়ে আরেকটা লাউঞ্জ। আরেকটা লিফ্‌ট। এবার এটাতে ঢুকলুম। এটা উঠল চোদ্দতলা। আমি প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছি। তানাবে নিজে নিজেই বললে—"উনিশতলায় আমাদের ঘর। এটা একটা হোটেল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এদিকে ওদিকে বিল্‌ডিংগুলো, টানেল দিয়ে দিয়ে জোড়া। এক একটা বিল্ডিংয়ের এক একরকম হাইট। কোনোটা দুতলা, কোনোটা সাত, কোনোটা চোদ্দ। বুঝেছ তো এবার?"

—"তা বুঝেছি। জাপানী ব্যাপার, সবই জলের মত সোজা।" ঘরে পৌঁছুলুম। জাপানী স্টাইল ঘর। একদিকটা পুরো মেটে মাদুরে মোড়া। জানলায় ভর্তি দেওয়াল, কাচের বদলে কাগজের সার্সি। অন্যদিকটা পাইনকাঠের প্যানেলিং। ঘরের মধ্যিখানে দারুণ একটা গালার কাজ করা ড্রাগন-ডাইনোসর-সাপ আঁকা অপূর্ব জল চৌকির মতন টেবিল। চমৎকার কাগজের লণ্ঠন জ্বলছে।

"এইটেই তোমাদের ঘর।" দেখিয়ে দিয়ে, কোমর ভাঁজ করতে করতে পিছু হেঁটে সেই সুন্দরী বেয়ারা বেরিয়ে গেল। মুরাসাকি-তোশিও-তানাবে গিয়ে ঝটপট ক'খানা রংচঙে কিমোনো চড়িয়ে এল

কোত্থেকে। এবার তারা বসে পড়ল টেবিল ঘিরে। আমিও কোটটি খুলে রেখে যেই বসেছি গিয়ে তোশিও বললে—"এভাবে বসা মানেই কিন্তু ট্রাডিশনের অপমান। যাও, আগে কিমোনো পরে এস।" আমি যেই শার্ট প্যান্টের ওপরে কোটের মত কিমোনোটি পরে এসেছি, ঘরে যেন বোমা পড়ল। তানাবে বলল—"শোনো, চাকলাবাকলাতি (ওরা চক্রবর্তী ওইভাবেই বলে) কিমোনোটা ওভারকোট নয়। অন্যান্য জামাকাপড় খুলে ওটাকে পরতে হয়।" আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে শার্ট প্যান্ট খুলে রেখে কিমোনো পরে এলুম। তোশিও-তানাবে চোখা-চোখি করলে। দুজনেই মাথা নাড়লে। ভুরু কুচকে সরু চোখ প্রায় বুজে ফেলে বললে—"কিমোনোর নিচে কেবল ভগবানের তৈরি চামড়াটুকুই থাকবার কথা, তোমার কিমোনোর নিচে ওসব কী?" —"কিছুই না। গেঞ্জিইজের" বলতেই তানাবে বলে উঠল—"ছি ছি ছি। কিমোনোর নিচে গেঞ্জিইজের? এ যে ব্লাসফেমি! না না, শিগগির যাও, খুলে এস। তোশিও ভীষণ আপসেট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। ওদের আবার সামুরাই-রক্ত, কথায় কথায় গরম হয়ে যায়। আমাদের মত চাষাভুষো তো নয়। মুরাসাকিও দুয়ের তিন ভাগ সামুরাই।"—

কী আর করা, ভগবানের চামড়ার ওপর কিমোনো পরে, ওই জলচৌকির পাশে নতুন বোয়ের মত আড়ষ্ট হয়ে গুটিসুটি কোনোরকমে এসে বসলুম। দেখি দরজা খুলে গেছে। একের পরে এক খাঁদা বোঁচা পরমাসুন্দরী মেয়ে স্বপ্নের মত কিমোনো পরে, অতিসুন্দর সব পাত্র বয়ে বয়ে ঘরে ঢুকছে। চারজন মেয়ে এসে বসল। টেবিল ভরে গেল খাদ্যে। সঙ্গে বেঁটে কুঁজোতে ভর্তি গরম গরম সাকে-মদ। খাবার-দাবারগুলো বেশির ভাগই কাঁচা। টেবিলে একটা উনুন মতনও রাখা হল। তাতে কাঁচা মাংস নেড়ে চেড়ে পাতে দেয়। আর কাঁচা ডিম সদ্য ভেঙে বাটিতে ঢেলে দিয়েছে, তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে হয়। সেটা সস। মেয়েগুলো মিষ্টি-মিষ্টি হাসে। আর কিচিরমিচির করে। আর মাথাটি হেলিয়ে দুলিয়ে কেবলই কুচো-গেলাসে সাকে-মদ ঢেলে ঢেলে হাতে তুলে দেয়। আপত্তি করা ট্রাডিশন বিরুদ্ধ। হাঁটু মুড়ে

বসে বসে দোজো-দোমো কীসব বলতে বলতে ওই মেয়েরা খুদে পেয়ালা কেবল ভরেই যাচ্ছে। আমরাও পেয়ালা খালি করেই যাচ্ছি। 'সাকে' খাবার আবার নিয়মকানুন আছে। কাপে ঢেলে তো দিব্যি আমার হাতে তুলে দিল। আমি যেই একচুমুক খেলুম, অমনি দেখি মেয়েটা আমার হাত থেকে থপ্ করে গেলাসটি কেড়ে নিয়েছে। নিয়ে নিজেই তাতে চুমুক দিচ্ছে। একি রে বাবা। কিছু বুঝবার আগেই আবার কাপটি আমার হাতে ফেরত চলে এসেছে। আমি একচুমুক দি, আর সেই মেয়ে একচুমুক দেয়। তারপর কাপটি ভরে দেয়। এরা হচ্ছে সাকে খাওয়ানোর সাকী, পেয়ালা ভরে দেয়াই এদের কাজ। খাচ্ছি তো খাচ্ছি, সাকে খেতে খেতে শরীর গরম, বেশ নেশা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। আর কাঁচা আনাজ কাঁচা মাছ খেতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হচ্ছে না। এমন সময়ে দেখি তোশিও-নো তার ডানহাতটা উপর দিকে তুলে ফেলেছে। কি সর্বনাশ। কেলেঙ্কারি কিছু ঘটবে নিশ্চয় এবারে। আর বাঁহাতটাকে বুক-পেটের মাঝামাঝি আড়াআড়ি ভাবে রেখেছে। বীরত্ব ফুটে বেরুচ্ছে ভঙ্গিতে। নিশ্বাস বন্ধ করে আছি।

দেখলুম কিছুই হল না। বেঁটে বেঁটে মিঠে মিঠে মেয়েগুলো থালাবাটি তুলে নিয়ে পেছু হেঁটে হেঁটে গুটি গুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তোশিও-নো হাতটি নামিয়ে নিয়েই, আবার ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ধরল। আমি ভাবলুম এবার বোধহয় আমাদেরই গুটি গুটি পেছু হটে বেরিয়ে যেতে বলছে। কিন্তু, না। দেখি দরজা খুলে গেল। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে মেয়েগুলি খুর্ খুর্ তুর্ তুর্ করে আবার ঘরে ঢুকছে। চায়ের নিয়মকানুন আলাদা। অত দোজো-দোমো করে সেধে সেধে চেপেচুপে খাওয়ানো নেই, পেয়ালা কেড়ে নিয়ে তেড়ে এসে চুমুক দিয়ে দেওয়াও নেই। সাকের বেলায় যেমন ছিল। নির্ভয়েই চা-পান-পর্ব শেষ হল। তবে চা-টা জলপাই-সবুজ রঙের। আর বুনো কষা স্বাদের। খেয়ে ভুলেও মনে হয় না চা খেলুম। তায় দুধ চিনি কিছু নেই। চীনেচার মত জুঁইফুল পর্যন্ত না। উপরন্তু সর্বক্ষণ উঁচু হয়ে হাঁটু ভাঁজ করে নীলডাউন ভঙ্গিতে বসে থাকা। জাপানের

সামুরাই ট্রাডিশন রাখতে কি আর বাঙালী কেরানী আমরা পারি? চা খাওয়া শেষ হতেই তোশিও-নো এককেবারে সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন—দুই পা ফাঁক করে দুই হাত আকাশে তুলে ইংরিজি 'এক্স' অক্ষরের মত চেহারা করে তিড়িক্ তিড়িক্ করে দুবার লাফালেন মেঝের ওপরে—ঘরে বেশ ভাইব্রেশন জাগলো। মুখে ইংরিজিতে মিলিটারি সুরে অর্ডার করলেন—"নাউ টু দ্য বাথ!" অমনি তানাবে এবং সেই শহরের নীরব অধ্যাপক মুরাসাকিও একবার ঠিক ঐভাবে নেচে উঠল—

"টু দ্য বাথ! টু দ্য বাথ!" যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। আমিও দেখাদেখি লাফাব বলে যেই উঠতে গেছি, উঠব কি, মুখ থুবড়ে পড়লুম মেঝের ওপরে। অতক্ষণ উপুড় হয়ে হাঁটু মুড়ে নীলডাউন হয়ে বসে থাকা।— দুটি পা জন্মের শোধ ঐ ভঙ্গিতেই রুদ্ধ হয়ে গেছে। ভাঁজ খোলে কার সাধ্যি! তা তিনবারের বার যেই পা সোজা হল, অমনি তোশিও-র মত করে দুবার ধুপ্ ধাপ্ লাফিয়ে নিলুম। লাফটা অত্যাবশ্যক। বোঝাই গেল। পাগুলো সোজা করবার জন্যে। মেয়েরা সব দোর ঠেলে বেরিয়ে খুর্ খুর্ তুর্ তুর্ করে হেঁটে আগে আগে যেতে লাগলো, পিছু পিছু মার্চ করে চলছি আমরা। প্রথমে:তোশিও-নো, তার পিছনে তানাবে, তার পিছনে আমি। আমার পিছনে মুরাসাকি। রহস্যময় কাঠের তৈরি টানেল, আধো-আলো থেকে আধো-অন্ধকারে। এঁকে বেঁকে চলেছে তো চলেইছে পাহাড়ের বুকের মধ্যে। আমরাও মার্চ করতে করতে যাচ্ছি। একটা লিফটের কাছে এসে রাস্তাটা বৈঠকখানা হয়ে গিয়ে শেষ হল। লিফটে উঠে স্পষ্ট দেখলুম :বাইশতলার নিচে জি-ফ্লোর তারও নিচে ও ফ্লোর সেই বোতাম টেপা হল। অথচ আসার সময় সাদাচোখে স্পষ্ট দেখেছি, চোদ্দতলা উঠলুম। নামছি চব্বিশ-তলা। এটা কেমন করে হচ্ছে?

সাকে-টা বড্ড বেশি হয়ে গেছে নাকি? খুদে খুদে পেয়ালা বলে টের পাওয়া যায় না তেজটা কী প্রচণ্ড। ও-ফ্লোরে নেমে দেখি সামনেই এক সুবিশাল জলকুণ্ড। উঁহু সুইমিং পুল না, কুণ্ড! কুণ্ডটা ভাগ

ভাগ করা আছে, জলের নিচে চৌকো চৌকো দেওয়াল, তার ওপর দিয়ে জল চলাচল করছে। ওখানে পৌঁছে গিয়ে মেয়েরা বিদায় নিয়ে গেল। তোশিও-নো, তানাবে, মুরাসাকি থপাথপ তাদের কিমোনো খুলে ফেলে ঝপাং ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরনে ভাগবতী চামড়া।

আমি আর কী করি? "যা থাকে কপালে" বলে আমিও চোখ বন্ধ করে কিমোনো খুলে সামনের কুণ্ডটায় ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বার্ড স্যাংচুয়ারির মত কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেল—তোশিও-নো ওদিক থেকে হেঁকে উঠলেন, "ওখানে নয়, এদিকে এস। ওটা হল লেডিস কুণ্ড।" আমি তো পালাতে পথ পাই না—তাড়াতাড়ি উঠে পাশের কুণ্ডে ঢুকে পড়ি। শিগগিরই দেখলাম লেডিসরাও এসে কিমোনো খুলে ফেলে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কুণ্ডে। এত স্ত্রী পুং কুণ্ড ভাগাভাগির উদ্দেশ্য আর যাই হোক, স্নাতকদের লজ্জা নিবারণ নয়। কেননা মাটির ওপরে যা কিছু লিঙ্গভেদের বন্দোবস্ত তা কেবল মেঝের ওপরে লাইন টেনে। শুধুই তাত্ত্বিক ভেদ, থিওরেটিকাল ডিসটিংশন। পর্দা বা দেয়ালের মত জাগতিক আড়াল আবডালের বালাই নেই। দেয়াল যা কিছু জলের নিচে। আর জল তো নয় অগ্নিকুণ্ড। গন্ধকের হলদে ধোঁয়ায় বাতাস আবছা, দৃষ্টি অস্পষ্ট, ওটুকুই আব্রু। চোখের দৃষ্টি কেবলই ঝাপসা হয়ে যায়। চতুর্দিকে হলদে হলদে গন্ধকচূর্ণ জমে আছে পাথরের ওপরে। আর গন্ধকবাষ্পের কড়া গন্ধে নাক ভরপুর। অথচ এতটুকু শ্বাসকষ্ট নেই। জল এত গরম, যে মনে হল একদম ঝলসে গেছি—এক লহমার মধ্যেই সাকে খাওয়ার যা যা কিছু নেশা সব ছুটে গিয়ে হাড়ে মজ্জায় ঝনঝনে জ্ঞানগম্যি এসে গেল।

যখন তোশিও-নো জল ছেড়ে উঠলো পেছু পেছু আমরাও উঠলুম ডাঙায়। কেউ কারুর দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছি না, আড়ে আড়ে। প্রত্যেকেই দেখছি প্রত্যেকের চেহারা ঠিক তেলে-ভাজা চিংড়ি মাছের মতন। লাল টকটক করছে। ভগবানের চামড়া। গন্ধকের ধোঁয়ায় অবশ্য সবাই কিছুটা আচ্ছন্ন। কিমোনো নিতে গিয়ে দেখি কিমোনো

কখন হাওয়া হয়ে গেছে। অ্যাঁ এবারে কি তবে বিনা কিমোনোতেই ফিরে যেতে হবে? আমি তো বসে পড়েছি প্রায় মাটিতে—এমন সময়ে দেখি মস্ত সাদা একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ অন্তরীক্ষ থেকে। প্রত্যেককে একটা। তোয়ালে লুফে নিয়ে গা মুছে তোয়ালে জড়িয়ে গুটিগুটি এগোচ্ছি, তোশিও বলল—"ওকি! ওকি! তোয়ালে রেখে যাও।"

তোয়ালে রেখে? তানাবে, মুরাসাকি ঝড়াঝ্ঝড় তোয়ালে মাটিতে ফেলে দিলে। অন্তরীক্ষ থেকে ফর্সা কাচা কিমোনো এসে গেল তাদের হাতে। বেঁটেখাটো একরঙা কিমোনো—গতবারের মতন রংচঙে বড়সড় নয়। দেখাদেখি আমিও। তবু ভাল, যাহোক একটা জামা পরে যাওয়া হবে ঘরে, অন্তত। গেঞ্জি-ইজের প্রভৃতি তো অনেকক্ষণই হলো বিস্মৃত দিনের উপকথায় পরিণত হয়েছে। তবু স্বীকার করতেই হবে, শরীর বেশ চনচনে মনে হয়েছে এই গন্ধকুণ্ডের জলস্পর্শে। পাতালের আগুন থেকে উঠে-আসা-জল—সেকি সোজা ব্যাপার?

আমরা পুনরায় মার্চ করতে করতে গিয়ে লিফটে চড়লুম। এবার উঠলুম উনিশতলা। নাঃ—মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে যাবে এবারে। আমার অবস্থা দেখে তানাবের মায়া হল। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিলো। এদের আসলে অনেকগুলো লিফট আছে, একেকটা একেক রকম লেভলে যাতায়াত করে। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন লিফটে চড়ছি বলে ভিন্ন ভিন্ন তলার হিসেব পাচ্ছি। পাহাড় কেটে কেটে ঘর বাড়ি তো একেক হাইটে এক এক তলা।

ঘরে এসে পৌঁছেই দেখি মাটিতে পাতা হয়ে গেছে চমৎকার বিছানা। ঠিক যেমন দেশের বাড়িতে বিছানা হয়। মেঝেয় একটি তোষক তাতে সাদা ধবধবে চাদর মোড়া, দুটি বালিশ, তাতে সাদা ধবধবে ওয়াড় পরানো; একটি লেপ—তাতেও দুগ্ধ-ধবল ওয়াড়। বালিশের নিচে ফর্সা কিমোনো ভাঁজ করা। দেখেই আরাম হল। পর পর চারখানা মাদুরে চারখানা বিছানা। শুয়ে পড়ব ভাবছি। কথাটা বলতেই তোশিও "শোবে মানে? স্নান করতে হবে না?"

—"আবার স্নান ? এতক্ষণ তবে কী করলুম ?"

—"ওটাকে ধুতে হবে না ? গামায় গন্ধকচূর্ণ বসে গেলে ঘা হয়ে যাবে যে !" বলেই লেফট-রাইট করে তোশিও বাথরুমে চলল। তানাবে আমাকে বললে—"যাও, তুমিও যাও, টু অ্যাট এ টাইম।"—এ আবার কিরকম নিয়ম রে বাবা ? একা একা কি বাথরুমে যাওয়াও বারণ ? বাথরুমে ঢুকে দেখি আশ্চর্য ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটি বিশাল স্টীলের বালতি। অর্থাৎ বালতির মত আকৃতির টব। খালি। তার পাশে দুটি টেলিফোন। ঘরে ঢুকেই কিমোনো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোশিও-নো ফোন তুলে কিছু কথাবার্তা বলল। দেখলুম এ ঘরে থরে থরে পরিষ্কার তোয়ালে সাজানো আছে। বাঃ ! এবং কিছু কিমোনোও। তোশিও দেখি টবের মধ্যে ঢুকে উবু হয়ে বসেছে। টবের কিনারা দিয়ে মাথাটি উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। অন্য টবে আমিও বসলুম। হঠাৎ দেখি বালতি আপনা আপনি গরম জলে ভরে উঠছে। তলা থেকে জল উঠে গলা পর্যন্ত ভরেই থেমে গেল। আমাকে কোনো কল খুলতে হল না, মগ-টগের তো বালাই নেই। জলে কেমন কেমন গন্ধ ?

—"এটা যে ওই স্পা থেকে। কুণ্ডের জল কিনা।" তোশিও বলল। আমি তো থ !

—ঘরেই আসে ? তবে কেন অত কষ্ট করে চব্বিশ তলা ঠেঙিয়ে পাতাল প্রবেশ, এবং সর্বসমক্ষে কিমোনো ত্যাগ ? দিব্যি বন্ধ দরজার ভেতরে বালতি করে চলে আসছে যখন, প্রথমেই তো এখানে নেয়ে নিলে হত।

—"দূর, তা কখনো হয় ? ট্রাডিশন বলে একটা ব্যাপার আছে না ? তোমার কিছু খেয়াল থাকে না, কুণ্ডস্নান একটা ট্রেডিশনাল কাস্টম ? এখানে ওই জল পাইপে করে আনা হচ্ছে, তার কারণ ওই জল না হলে গা থেকে গন্ধকের গুঁড়ো উঠবে না।"—এক সময়ে ঐ জল আবার আপনা আপনি নেমে গেল, বালতি খালি হয়ে গেল। যেন ম্যাজিক। কোথা দিয়ে যে আসছে, কোথা দিয়ে যে যাচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছি না। জলটা যেন জ্যান্ত।

—"এবার ফ্রেশ ওয়াটার।"

—"সাবান ? সাবান আছে ?"

—"সাবান ব্যবহার করা ট্রাডিশনে নেই।"

—"আই সী। ফ্রেশ ওয়াটার এলেন। ফ্রেশ ওয়াটার গেলেন। দিব্যি ঝরঝরে লাগছে। লাফিয়ে উঠে পড়ছি, তোশিও-নো ডান হাত নেড়ে ফেললেন। আমার বাঁ হাতটি ডানহাতে বজ্র মুষ্টিতে ধরে এক ঝাঁকুনিতে ফের বসিয়ে দিলেন বালতিতে। "এইবারে আসল স্নান। এলিকসির অফ বাথ। এইবারে যে জলটা আসবে সেটা হচ্ছে পিওর কপার মিশ্রিত। বিশুদ্ধ তাম্রলিপ্ত জলে স্নান করলে তবেই তো গন্ধক কুণ্ডে স্নানের পূর্ণ উপকারটা পাবে ?"

—জল আসতে শুরু করেছে। আপাদমস্তক কথাটার মানে বোঝা যাচ্ছে, পা থেকে জল উঠছে। আপাদস্কন্ধ উঠবে।—"গাউথামা বুদার নির্দিষ্ট প্রণালীতে এই রিচুয়াল বাথটা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ তো তোমাদের দেশেরই, "অ্যাব্যা-গ্যায়ানা" বাথ। তোমাদের মন্দিরে এসব ব্যবস্থা নেই ?" মনের আনন্দে ডুবতে ডুবতে তোশিও বলল। ও হরি ! এর নাম অবগাহন ? গৌতম বুদ্ধের প্রণালী ?

"আমাদের দেশে এসব যন্ত্রপাতি এখনো পৌঁছয়নি। ডিভেলপিং কান্ট্রি। এখনও বানাতে শিখিনি।"

—"আড়াই হাজার বছরেও বানাতে শেখনি ? তাজ্জব কথা !" থুপে থুপে গা মুছতে মুছতে তোশিও বলল। লজ্জায় চুপ করে যাই।

ঘরে ফিরেই চমৎকৃত। দেখি তানাবে মুরাসাকি দুজনেই ঝাঁ চকচকে উলঙ্গ, তারাও পাশের বাথরুমে গিয়ে দ্বৈত স্নান সেরে এসেছে। জোড়ায় জোড়ায় নাইতে হয় এখানে। আপাতত তারা গম্ভীর মুখে কিমোনো ভাঁজ করছে। বালিশের নিচে যত্ন করে কিমোনোটি রেখে তারা মিষ্টি হেসে শুভরাত্রি বলে শুয়ে পড়ল। আমার আর লজ্জা করবে কি।

—"এ জন্মের মত আর হয়ে গেছে যা হবার।" এমন কি লেডিস কুণ্ডে পর্যন্ত নেমে পড়েছি। আমি ফিসফিসিয়ে তোশিওকে বললাম—

"এবার গেঞ্জি-টেঞ্জি ইজের-টিজেরগুলো পরে নিলে কি ট্রাডিশনের অবমাননা করা হবে ?"

—"পরতে পারো কিন্তু কেন পরবে ?" তারপর তানাবের দিকে লক্ষ্য করে বলল—"ওরা চাষাভুষো মানুষ। লজ্জা শরমের বালাই নেই, কিমোনো খুলে ফেলেছে। ছি ছি ছি !"

—"তুমি বুঝি কিমোনো পরেই ঘুমোও ?"

—"দূর কিমোনো পরে কেউ ঘুমোয় ? আমি লেপের নিচে ঢুকে খুলে রাখব। সেটাই সভ্যতা।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি সবাই প্রস্তুত। জলচৌকিতে জাপানী ব্রেকফাস্ট চলে এল। কাঁচা মাছ, কাঁচা ডিম, গরম স্যুপ, গরম ভাত, পাঁপর ভাজার মতন কুড়মুড়ে সবুজ শ্যাওলা ভাজা। শসার আচার। খেয়ে দেয়ে রওনা দিলুম। জুতো জামা রাখা ছিল যেখানে সেখানে যেতেই ট্রেতে করে তত্ত্বের মতো সযত্নে সাজিয়ে বিল এলো। তোশিও তানাবে, আমি এবং মুরাসাকি, সকলে মিলে বিল নিয়ে কিঞ্চিৎ কাড়াকাড়ি চলল—শেষটায় মুরাসাকিই দিয়ে দিলে। কেননা সেইটেই নাকি ট্রাডিশন। ওটা ওরই শহর, আমরা ওর অতিথি। জাপানী ভাষায় বিলটা লেখা ছিল, তাই কাড়াকাড়ি করলেও বিলটা যে কত তার বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝতে পারিনি। ছবির মত সুন্দর বিল, হ্যাণ্ডমেড পেপারে তুলি দিয়ে আঁকা। যেন বাঁশের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার জন্য।

জোবান থেকে কাজিওয়াতা। সেখানে মুরাসাকিকে বিদায় দিয়ে আমরা ট্রেনে উঠলুম, ইউয়াকি। ইউয়াকি স্টেশনে নেমে তানাবে মনে করিয়ে দিল—"হারানো ক্যামেরা পুনরুদ্ধার করবে না ? বের কর তোমার কাগজপত্তর পাসপোর্ট কমপ্লেনের কপি।" এসব সময়ে তোশিও-নো অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। এবম্বিধ তুচ্ছ ব্যাপারে মন দেওয়া সামুরাইদের যোগ্য নয়। তানাবে বলল,—"তুমি কাগজপত্র বের কর, আমি একটু মেনস রুম থেকে ঘুরে আসছি।"

—আমি স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে "গুড ইভনিং" বলতেই সে বলে উঠল,

—"কামেলা ?" এবং ড্রয়ার খুলে তোদের বৌদির বক্স ক্যামেরাটি বের করে দিয়ে এক গাল হেসে বললে—"তু ওলদ। নিউ বাই।" আমি তাড়াতাড়ি বললুম—"আইডেন্টিফিকেশন ? পাসপোর্ট নম্বর ? এক্সপোজার নম্বর ? পেপার্স ?" স্টেশন মাস্টার হেসেই কূল পায় না। গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে।—"হোয়াত আইদেনতিফিকেশন ? ইউ ইনদিয়ান। আই নো ইনদিয়ান লস্ত ওলদ কামেলা।" সত্যিই তো ? আমার চামড়াই তো আমার আইডেনটিটি। এই সুদূর উত্তর পূর্ব জাপানী মফঃস্বল শহরে আর কজন ভারতীয় এসে বক্স ক্যামেরা হারাচ্ছে ? আর এর জন্যে কি না এত ঝামেলা কাজিওয়াতাতে—ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট গেছে ফর্ম ভরতে। বেরিয়ে দেখি তোশিও আর তানাবে কী সব পরামর্শ করছে। আমাকে বললে, "ক্যামেরা পেয়েছ তো ? চলো, বাড়িতে গিয়ে সব কথা হবে।" কিসের পরামর্শ ? গাড়িতে যেতে যেতেই প্রশ্ন করি। ব্যাপার কি ? তানাবে বললে "মুরাসাকি যদিও বিলটা দিয়েছে, কিন্তু বিল হয়েছে বিরাট। ওটা কোনো একজনের স্বন্ধে ফেলে দেওয়া যায় না। এখন ওকে কী ভাবে আমরা আমাদের অংশটা শোধ করতে পারি, ট্রাডিশন অনুযায়ী, তোশিওকে তাই জিজ্ঞেস করছি। আমরা চাষাভূষো লোক—আমরা অত আদব কায়দা জানি না তো ? তিনজনে মিলে এক লক্ষ কুড়ি হাজার ইয়েন পাঠালেই হিসেবটা এক হবে, এইটুকু বলতে পারি আর কি। "(অর্থাৎ চার হাজার টাকা।) তোশিও নো গম্ভীর-ভাবে মাথা নেড়ে বললেন—"চিঠি লিখতে হবে। লিখতে হবে—তোমার যত্ন-আত্তিতে এবং অতিথি সৎকারে আমরা তৃপ্ত। যারপরনাই খুশি হয়ে এই টাকাটা সেই বিমল আনন্দের প্রকাশ-স্বরূপ তোমাকে পাঠাচ্ছি।—ওনলি অ্যাজ এ টোকেন অব আওয়ার জেনুইন অ্যাপ্রিসিয়েশন"—অর্থাৎ বখশিশ ? বন্ধুর আতিথ্যের শেয়ার দেওয়া মানে ট্রাডিশনের অবমাননা। কিন্তু বখশিশ ? সামুরাইদের বার্থরাইট ওটা।

আবার চমৎকার হ্যাণ্ডমেড পেপারে ছবির মত অক্ষরে তুলির মত

কলমে লেখা হল সেই কিম্ভূত চিঠি। এবার সই করার পালা। বলাবাহুল্য, প্রথমেই তোশিও। তার-পরে আমি, যেহেতু আমি চক্রবর্তী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, যারা রাজ্য-শাসনও করত—সেহেতু সামুরাইয়ের পরেই জাতিগত ভাবে আমার স্থান উচ্চে। সবার শেষে তানাবে। (ব্যাটা চাষা)—"আমি কি বাংলাতেই সই করব ?" তোশিও বললে "না ! বাংলা কেন, কোনো ভাষাতেই তুমি এ চিঠি সই করতে পার না। কেন না এটা জাপানী ভাষায় লেখা। এবং তুমি জাপানী পড়তে পার না। যে ভাষা তুমি পড়তে পার না, সে ভাষায় লেখা কোনো ডকুমেণ্টেই আমরা তোমাকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে পারি না। সেটা বে-আইনী।" —তবে ? এইমাত্র আমার অংশটা আমি শুধে দিয়েছি—যা কিছু বক্তৃতার দক্ষিণাস্বরূপ জুটেছিল, সবটা গেছে ট্রাডিশনের দয়ায়, জোবানের গন্ধকের বাষ্পে ! এখন সইও করতে পারব না ?—"তাহলে আমি কি তাকে আলাদা ইংরেজিতে চিঠি দেব ?" এবারে তানাবে হাসল—"ও কি ইংরিজি জানে ?" 'তাই তো ! তবে ?"

—"তবে আর কি ? তোমার নামটা আমিই সই করে দিচ্ছি জাপানী ভাষাতে। তাহলে আর কোন গণ্ডগোল হবে না।" গুরুগম্ভীর রায় দিলেন সামুরাই তোশিও-নো। আমার বদলে—তিনি সই করলে সেটা যদি বে-আইনী না হয় তাতে আমার আর বলবার কিছুই থাকে না।

হাসিমুখে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কেবল আমার মুখের হাসিটি উবে গেল। —"এত বেশি খরচ হলে আর কোনো ভালো জিনিসকেই কি ভালো লাগে ?"—আশ্চর্য কথা—তানাবে তোশিও তুজনেই আমার এ দুঃখুটা কিন্তু দিব্যি বুঝতে পারলে। কি চাষা, কি সামুরাই বেশি খরচের দুঃখটা সবাই বোঝে। —"আমার গাড়িটার মতন হল আর কি।" তোশিও বলে।

—"গাড়ি ? তোশিও-নো, তুমি গাড়ি চালাও না শুনেছিলুম যে ?"

—"গাড়ি চালায় না ঠিকই। তা বলে গাড়ি থাকবে না কেন ?

কোনো ইউনিভার্সিটি প্রফেসারের গাড়ি নেই, এটা লজ্জার কথা!" তোশিওর হয়ে তানাবেই উত্তর দেয়। —"যেমন তেমন গাড়িও নয় তোশিও-নোর। স্পেশাল অর্ডার দেয়া গাড়ি। দেখতে যাবে একদিন?"

—"বেশ তো। আজই চল না। গাড়িও দেখবে, চাও খাবে।" তোশিও নেমন্তন্ন করলে।

বিকেলে গেলুম। সত্যিই দারুণ গাড়ি। গ্যারাজ আলো করে আছে।

ভেতরে ছোট রেফ্রিজারেটর ফিট করা। তাতে বরফের ট্রেতে গোলগোল আঙুরের মত বরফ জমেছে। ছোট্ট কাবার্ডে দামী স্কচ, গেলাস সাজানো! গদির মত কার্পেট মোড়া গাড়ির ভেতরটা। সামনে ড্যাশবোর্ডে ছোট টেলিভিশনে রঙিন জাপানী নাটক হচ্ছে। পাশে একটা কুলুঙ্গিতে কার্পেটের সঙ্গে রং মেলানো টেলিফোন। ঠিক খেলনার মতন। ছোট্ট।

—"ফোনটা সত্যিকারের?"

—"এখান থেকে বাড়িতে ফোন করতে পারো। করবে? নিউইয়র্ক অস্‌লো—সব পাওয়া যায়।"

আমি তো হাঁ। এমন গাড়িখানা, অথচ তোশিও অফিসে আসে ট্রেনে, বাসে? ব্যাপার কি? ওই ব্যাপার। গাড়ি চালানোর মত নীচকর্ম সামুরাই করে না। কিন্তু শোফার রাখার মত বেতনও বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না। তার ওপর গাড়ির মেইনটেনেন্স খরচ আছে না? দু' দুবার পুরো কার্পেট, আপহোলস্ট্রি, ফ্রিজ, টিভি, বদলাতে হয়েছে না?

—"কেন? আউট অব ডেট হয়ে যায় বুঝি?" আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

—"তা নয়। মানে বাড়িটা তো সমুদ্রের ধারে। দু'দুবারই টাইফুনে সমুদ্রে বান ডেকে, গ্যারাজসুদ্ধ গাড়ি জলের নিচে ডুবে গেছিল! তাই বদলাতে হয়েছে।"

—"এঞ্জিন আছে?" হঠাৎ কি মনে করে বলি।

—"নেই? বাঃ! তবে আর গাড়ি কেন? বাড়ি হয়ে যাবে তো। তানাবে, দেখিয়ে দাও তো স্টার্ট দিয়ে" তোশিওর স্বরে আহত সম্মানের ছোঁয়া।

—"থাক, থাক। আর দেখাতে হবে না। এই গাড়িটা ব্যবহারে লাগে না এটা বড়ই দুঃখ কিন্তু?"

—"কে বললে কাজে লাগে না? এই তো কাজে লাগছে।" হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে তোশিও বলে। "দিব্যি ভালো একটুখানি জায়গা এয়ারকনডিশন করলেই চলে যায় বেশ 'কোজি', এন্টারটেইন করার পক্ষে মন্দ কি?"

অর্থাৎ এটা ওর গাড়ি নয়, বাড়িই। ওর বৈঠকখানা আসলে। ভালো।

তানাবে বললে, "জোবানে বড্ডই খরচ হয়ে গেছে। চাকলা-বাকলাতির জন্যে আমাদের একবার সুজিকিতে যেতেই হবে। চল, কালই সুজিকি যাই।" আমি হাঁ হাঁ করে বাধা দিই "আর ভাই কোথাও যাব না। খুব ভাল লাগছে জাপানে। কিন্তু হাতে টাকা নেই। আরও তো তিনচার দিন থাকতে হবে।"

—"টাকা লাগবে না। সুজিকি তো জাপানের মহারাজার অতিথিশালা। ৯০০ অব্দ থেকে এখানে মাত্র এক টাকা করে নামমাত্র সেলামী লাগে। খেতেও একটাকা। শুতেও এক টাকা। চল, চল খুব সুন্দর জায়গা। ট্রাডিশনাল অতিথিশালা কাকে বলে দেখে আসবে।" শুনে খুব উৎসাহ পেলুম। শহরে থাকলেই বরং খেতে-শুতে ঢের বেশি খরচ। তার চেয়ে ওখানেই দু-তিনদিন কাটিয়ে আসা ভাল। তানাবে বললে—"কাল লাঞ্চের পরই বেরিয়ে পড়ব।"

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে একটি ছোট টিলার ওপারে বনের মধ্যে কাঠের বাড়ি। চমৎকার প্যাগোডার মতো দেখতে। কাঠের থাম। দরজা। খিলেন। ঘরে বিরাট প্রদীপ জ্বলছে।

—লালেতে কালোতে সোনাতে কাঠের ওপর গালার কারুকার্য করা বারান্দা। অপরূপ বারান্দা। পুরোনো বলে পুরোনো? বলে দিতে হয় না, যে ৯০০ অব্দের। বিদ্যুৎ নেই। সবকিছু সেই পুরোনো দিনের মতই। খুব সম্ভ্রান্ত ঘরদোর। খুব ট্রাডিশনাল। তোশিও মহা তৃপ্ত।— "এখানকার খাদ্যও আধুনিক নয়। ৯০০ অব্দের মেনু অনুযায়ী রান্না হয় এখানে।" বাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে এক থুত্থুরে বুড়ো আর তার থুত্থুরী বুড়ী পাহারা দেয় বাড়িটার। বেলা চারটেয় পৌঁছেছি। বুড়ী রাগ করে বললে—"এত বেলায় এলে, ডিনার দিতে দিতে রাত ৯টা হয়ে যাবে। তা যাক, এখন চা খাও।"

—"এরাও কি ৯০০ অব্দ থেকে আছে?"

—"তা বলতে পারো, এরা আছে নব্বুই বছর। কিন্তু এই কাঠুরের পরিবারই এই জায়গার ট্রাডিশনাল খবরদারি করে আসছে সেই ৯০০ অব্দ থেকে। পূর্বপুরুষের অধিকারক্রমে এরা চাকরি করে যাচ্ছে।"

—"বুড়ো মারা গেলে কী হবে? ছেলেপুলে আছে?"

—"আছে। শহরে চাকরি করে। বুড়ো মরলে তাকে এই বনে এসে এই কাজ নিতে হবে। কিন্তু সে নিতে চায় না। তার বউও।" হঠাৎ তানাবে থেমে গেল। তোশিও সূত্রটা তুলে নেয়—

—"তার বউও ঠিক আমার বউয়ের মত খুব শহর ভালবাসে। কিন্তু ছেলেটা আমার মত নয়। তাই সেও শহরে থেকে গেছে বউয়ের কিমোনোর পিঠে ওবি হয়ে। যত মেনিমুখো ছেলে। হুঁ,"—নাক দিয়ে বিশ্রী শব্দ করে অবজ্ঞা প্রকাশ করা তোশিওর মুদ্রাদোষ।

—"মেয়েদের কথায় চলেছ কি প্রলয় অনিবার্য। মেয়েরা থাকবে মেয়েদের মত। এই যে তানাবে, বৌকে চাবি দিয়ে রাখে—ঠিক করে। ওরা চাষা—ওদের সব ব্যাপার সোজাসুজি। এটা কিন্তু খুব প্রশংসার।"

—"এই কাঠের বাড়িটার কাড়ি-বরগাগুলো দেখেছো? এই যে দামী কাগজের লণ্ঠন? এই যে মাদুর?"—নির্বিকার গলায় ঠিক এই সময়ে তানাবে আমাকে রাজ-অতিথিশালার ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য প্রদর্শন

করতে থাকে। কড়িবরগা দেখব কি? তোশিওর কথা শুনে তো আমি হাঁ! শিষ্ট, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ঐ তানাবে, সে কিনা বৌকে চাবি দিয়ে রাখে? অথচ বেশ তো সুস্থ স্বাভাবিক দেখায় ওকে! বেচারী বউয়ের অপরাধ সে পরমা সুন্দরী!

আশ্চর্য দেশ বটে জাপান! ছোট শহর ইউয়াকিতে এই চলেছে. অথচ টোকিওতে দেখে এলুম একটা রেস্তরাঁ হয়েছে গিনজাতে, টোকিওর চৌরঙ্গী, যেখানে স্বাধীন মেয়েরা এসে নিয়মিত সন্ধ্যাবেলা তাদের পুরুষসঙ্গী ভাড়া করে নিয়ে যায়। ওটাও যে দেশে চলছে তোশিও-তানাবের বউশাসনের চাষী-সামুরাই ডিরেকট মেথডও সেখানেই চলছে। সত্যি, কী ভুলই যে করেছি জাপানী মেয়ে বিয়ে না-করে। তোদের বউদি তো পারলে আমাকেই চাবি দিয়ে রাখে, নেহাত আপিস যেতেই হয় তাই!"

—"তা, আনলে না কেন একটা জাপানী বউ ধরে? তবু তো লোকে দেখত একটা কিছু আনলো। চাবি দেব না আরো কিছু— যা গুণবান দাদামণিটি তোমাদের এক্ষুনি আমি দাতব্য করে দিচ্ছি, দেখবি কেউ ওকে ভুলেও নেবে না। ঈঈশ্‌শ্‌"—বৌদি ফোঁস্ করে উঠতেই দাদা বেগতিক বুঝে আবার গল্প ফেঁদে ফেলেন—

—"আমি স্তম্ভিত. ওদিকে তানাবে দিব্যি শান্ত মুখে বলে যাচ্ছে— 'এই যে কাঠের জলচৌকিটা দেখছ, এটা তৈরি হয়েছে হিরোসাকিতে। বিখ্যাত মধ্যযুগীয় শিক্ষাকেন্দ্র। অবশ্য আপাতত আপেল চাষের জন্যই বিখ্যাত।'—'সামুরাইদের আড্ডা বলেও প্রসিদ্ধ ছিল ওটা'—তোশিও যোগ করে দেয়। কী স্বাভাবিক ভাবেই না ওরা বউ ত্যাগ, বউবন্দীর প্রসঙ্গ আলোচনা করে!

বিচ্ছিরি সবুজ চা খেয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। চারিদিকে জাপানী জঙ্গল, তাতে চমৎকার সব জাপানী পোকামাকড় ডাকছে, পটে আঁকা ধানক্ষেত, গ্রাম আরো দূরে প্রশান্ত মহাসমুদ্র দেখা যাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে যায়। ক্রমশ রাত হল। ৯টার সময়ে খাবার এসে পড়ল। খাবার মানে একটা ভাতের ফ্যানের মতন সুপ, ওরা বলল

বাক্‌হুইট হচ্ছে খুব শক্ত দানার এক রকম শস্য, গমেরই জাতভাই, তবে মানুষে আজকাল ওটা বড় একটা খায় না।—"মধ্যযুগের জাপানে খুব খেত। আজকাল কষ্ট করে যোগাড় করতে হয়।" —তোশিও জানালেন সগর্বে। "সেদ্ধ হতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।"—

—"প্রেসারকুকার নেই?"

—চাবুক মারলে যেমন কুঁকড়ে ওঠে মানুষে, তেমনি কুঁকড়ে গিয়ে তোশিও-নো বললেন "চাকলাবাকলাতি। মাদার ইণ্ডিয়ারও তো গ্রেট ট্রাডিশন আছে? তবে তুমি কী করে বারবার ট্রাডিশনকে অবমাননা করছ? শুনছ এরা কত কষ্ট করে বাকহুইট যোগাড় করে··· সেটা কি প্রেসারকুকারে রাঁধবে বলে? ওটা কি মধ্যযুগের ট্রাডিশনাল বাসন? এখানে রান্নাবান্না সব হয় ৯০০ অব্দের নিয়মে। মেনু, রেসিপি সব কিছু ৯০০ অব্দের। তুমি সম্রাট হিরোহিতোর অতিথি!"

—ঐ স্যুপ বোলের পাশে দুটি ছোটো ছোটো নীলরঙের ডিম। আমাদের বাড়িতে সেই যে কাকে একবার বাসা বেঁধেছিল নীল নীল ডিম পেড়েছিল, মনে আছে? দেখতে অনেকটা সেইরকম।" দাদামণি থামলেন।

—"কিসের ডিম ছিল ঐগুলো? কাগের? এঃ ছি ছি!" বৌদি মুখ বিকৃত করেন।

—"কোয়েলের। কোয়েলের ডিম, নিদেনপক্ষে পঁচাত্তর বছরের পুরোনো। ওখানে পঁচাত্তর কেন, দেড়শ বছর পর্যন্ত পুরনো ডিম পাওয়া যায়।

সেই ডিম ভেঙে গরম স্যুপে ফেলে গুলে দিতে হয়। মানে যার নাম চীনে রেস্তরাঁয় এগড্রপ স্যুপ। সেই স্যুপই প্রধান খাদ্য। এছাড়া ওই বাক্‌হুইটের তৈরি একরকমের কেক, অখাদ্য (না-নোন্তা, না-মিষ্টি) আর সবশেষে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টিভাতের ডেলা, জলজ উদ্ভিদের সবুজ ফিতে দিয়ে বাঁধা। এই খাদ্য, সঙ্গে সাকে আছে অবশ্য। বুড়ি এসে হাঁটু মুড়ে বসে দোজো-দোমো করে সাকে খাওয়ালো, জোবানের সেই মেয়েদের মতন কায়দা করেই। যত্নের অভাব নেই।

খেয়ে দেয়ে পরিষ্কার করে পাতা বিছানায় শুতে যাচ্ছি—(এখানে বিছানা অন্য রকমের, বালিশ আর দুখানা কম্বল, একটাকা ভাড়া)। বুড়ো এসে হাঁ হাঁ করে আটকালে, হাতে একটা মস্ত তোয়ালে ধরিয়ে দিলে। কী ব্যাপার ? তোয়ালে পেতে শোবো ?

—"শোবে না—আগে স্নান করতে হবে"—তানাবে হাসতে হাসতে বলে—সম্রাট হিরোহিতোর নিয়ম। ৯০০ অব্দে উনি আইন করে গেছেন এখানে যে-পথিকরা আসবে, আগে স্নান, তবে তাদের শোওয়া। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই নিয়ম।"

"বেশ।" স্নানের ঘরে চললাম। মস্ত বড় ঘর। তাতে পাশা-পাশি চারটে ডেকচি মাটিতে বসানো, জল ফুটছে। পাশে ঠাণ্ডা জলের বালতি, মগ সব আছে। একসঙ্গেই তিনজনের স্নান শুরু হল। স্নান করতে করতে মনে হল—জলটা কিসে ফুটছে ? নিচে তো কৈ কোনো উনুন দেখছি না ? তোশিওকে জিজ্ঞেস করতে তিনি মৃদু হেসে বললেন—"এখানে উনুন লাগে না।" আরেকটু হেসে তানাবে বললো—"উনুন নেই বলেই তো রান্না হতে অত দেরি হল"—

..."আর সব রান্নাই কেবল সেদ্ধ ? দেখলে না ? এটাই ট্রাডিশন।"

এরা কি ধাঁধা বলছে ? এদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ? উনুন নেই অথচ সেদ্ধ হচ্ছে, জল ফুটছে ব্যাপারটা কী ?

নাঃ জাপানী ঐতিহ্য আমার বাঙাল ব্রেনের পক্ষে বেশী সূক্ষ্ম।

—"উনুন নেই তবে জল ফুটছে কেমন করে ?" তোশিও-তানাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাস্য বিনিময় করে—

—"ওই তো মজা ! ৯০০ বছরের ঐতিহ্য !"

গা মুছতে মুছতে আমি চতুর্দিকে তাকাতে থাকি, কোনো পাইপ ?

নাঃ। ব্যাপার কী ? গরম জলের রহস্য কিনারা হল না। ঘরে এসে শুয়ে পড়ে, তোশিও রয়ে সয়ে বললো—"আসলে এটা একটা আগ্নেয়গিরির গায়ে কিনা। ওই জলের পাত্রগুলো যে-ফাটলের ওপর বসানো, তাতেই জল আপনি ফোটে। রান্নাও হয় ফাটলের ওপর

পাত্র বসিয়ে। ওপাশে বড় মুখটা আছে কাল সকালে যাব দেখতে। সেটা এখন একটা হ্রদ। কত রকমের পাখি আসে। অস্ট্রেলিয়ান পাখি, মঙ্গোলিয়ান পাখি, কোরিয়ান—প্যাসিফিক আইল্যাণ্ডের পাখি বিউটিফুল দৃশ্য।

আর পাখি! আর বিউটি! আমার প্রাণপাখি তো উড়ে গেছে। ভলক্যানোর ওপরে শুয়ে শুয়ে চোখে ঘুম আসে? কিন্তু আমার বন্ধুদের ভয়ডর নেই। তারা নিশ্চিন্ত। তোশিও-তানাবের প্রচণ্ড নাক ডাকছে। তোশিওর সামুরাই স্টাইলে "ঢ্যারারাম ঢ্যারারাম ঢ্যাম"··· তানাবের চাষাড়ে স্টাইলে ·সাঁই গুড় গুড় সুঁই।" কেবল আমারই চোখে ঘুমের বদলে সর্ষে ফুল।

পর দিন সকালে ওরা লেক দেখতে গেল। আমিও গেলুম। শান্ত নীল জল ভরা চমৎকার হ্রদ। কিন্তু হ্রদে একটিও পাখি নেই। পাখি কেন নেই? তোশিও ভুরু কুঁচকে খুব ভাবিত হয়ে পড়ল। "ছেলেবেলা থেকে এখানে আসছি···জীবনে কখনো এই হ্রদের পাখি-হীন চেহারা দেখিনি। আশ্চর্য ব্যাপার!"

"আজকল ইকোলজিক্যাল চেঞ্জের ফলে নানারকম অদল বদল হচ্ছে"—

আমার সায়েন্টিফিক সান্ত্বনাবাক্য থামিয়ে দিয়ে তোশিও বলে ওঠে···"ট্রাডিশন ওসব আধুনিক ইকোলজির ধার ধারে না। বুঝলে?"

এবার সবিনয়ে তানাবে বলতে গেল—"কিন্তু পাখিরা কি সেটা জানে?"—

—"অবশ্যই জানে। তারা শত শত বছর ধরে আসছে এখানে। এটা তাদেরও ট্রাডিশন। আশ্চর্য! এটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগছে না।" আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে তোশিও। ইতিমধ্যে আমাকে কেউ একলক্ষ ইয়েন ঘুষ দিলেও আমি যে আর আগ্নেয়গিরির মাথায় বিশ্রামশালার আতিথ্য উপভোগ করতে পারবো না—তাতে ট্রাডিশন থাকুক আর চুলোয় যাক—এ ব্যাপারটা আমি

তানাবেকে বেশ প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। ফলত, লাঞ্চের আগেই আমরা—প্রাকৃতিক শোভা ছেড়ে, ঘিঞ্জি শহরে নেমে এসে যেন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। সুজিকি রইল দুশো মাইল দূরে।

সেই রাত্রে আমাদের ইউয়াকি শহরে পরপর দুবার ভূমিকম্প হল। কেউই অবশ্য প্রাণে মরেনি তবে এবার বুঝলাম কেন জাপানে কাগজের জানলা হয়, কাঠের বাড়ি হয়। কিছু তেমন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হল না।

ইউয়াকি ছেড়ে যাবার পালা এবার। তোশিও তানাবে সজল চক্ষে স্টেশনে এল বিদায় দিতে। বার দু-তিন কোমর ভাঁজ করে, সামুরাইয়ের পবিত্র ডানহাত এবং বাঁ হাত বাড়িয়ে তোশিও আমার দুই হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল—হাত আমার পুণ্য হয়ে গেল। ওদিকে চাষী তানাবের বিনয় নম্র কোমর ভাঁজ করা আর থামে না। "কলকাতায় দেখা হবে", ট্রেন ছেড়ে দিলো।

টোকিওতে এসে পরদিনই রেডিওতে বড় খবর—

"হাজার বছর পরে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সুজিকি জেগে উঠেছে, আগুন, পাথর, লাভা, উদ্গিরণ করছে, লাভাস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিলার নিচেকার গ্রামের মানুষেরা সব প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ইউয়াকি শহর উদ্বাস্তুতে ভরে গেছে···

খুবই দুঃখের কথা সম্রাট হিরোহিতোর প্রতিষ্ঠিত নশো বছরের প্রাচীন রাজকীয় ধর্মশালাটি, ও তার বৃদ্ধ সংরক্ষকদম্পতি এই অগ্ন্যুদ্গারে ধ্বংস হয়ে গেছে।"

দাদামণি দম নিতে থামলেন। চুরুটের লম্বা সাদা ছাইটা ঝেড়ে নিয়ে, বৌদির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে বললেন—"এর পরেও কি তুমি বলবে, প্রেজেন্ট কেন আনিনি? নিজেকে যে ফেরত এনেছি এটাই একটা উপহারস্বরূপ হল না? তোমরাই বল?"

আমরা আর বলব কী আমরা ভয়ে চুপ। এরকম একটা খবর যেন কাগজে পড়েছি বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, পড়েছি। নির্ঘাত।

বৌদির পিঠের চাবিটা ঝনাৎ করে উঠল। বৌদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"পারোও বটে! যতো বাজে কথা। আসুক তোশিও-তানাবে। আমি ওদের জিজ্ঞেস করবো জোবানটা বেশি ভয়ের জায়গা না সুজিকি। আর বউশাসন? তার ব্যবস্থাও ঠিক করবো। আসুক না তোমার সামুরাইরা একবার কলকাতাতে!"

॥ এক্সপেন্স অ্যাকাউণ্ট ॥

অনেক দিন বাদে দেশে ফিরেছি, নেমন্তন্ন খেতে খেতেই প্রাণ যায়। বিদেশে থাকতে টেলিভিশনে দেখতুম ভারতবর্ষে বন্যা হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, কিন্তু সশরীরে এসে তো দেখছি উলটো! কে বলে এ দেশে দারিদ্র্য আছে? আজ লাঞ্চ, কাল ডিনার, পরশু ককটেল, আজ এই ক্লাবে খাওয়ানো, কাল সেই ক্লাবে খাওয়ানো—একেবারে সাহেবী ব্যাপারস্যাপার। সাহেবরা চলে গিয়ে এখন দেশশুদ্ধ সবাই সাহেব হয়েছি। মধ্যবিত্তের ঐশ্বর্য ঢের বৃদ্ধি পেয়েছে মনে হচ্ছে। নেমন্তন্ন করলে আগে লোকে বাড়িতে ডেকে যা করে রেঁধেবেড়ে খাওয়াতো এখন সবাই সবাইকে বাইরে খাওয়ায়। আগে "খাওয়াদাওয়া" শব্দটার মানে ছিল: লুচি মাংস দই মিষ্টি।

আর এখন? "খাওয়াদাওয়া" মানেই হচ্ছে: হুইস্কি-সোডা-জিন-রাম। কোল্ড ড্রিংকের ব্যবস্থাই থাকে না অনেক সময়ে। মদ না খাওয়ালে সেটা মোটে "খাওয়ানো" বলে গণ্যই হলো না। আমি তো মাঝে মাঝে ব্যাগে করে নিজের জন্যে কোল্ড ড্রিংকের সাপ্লাই নিয়েই বন্ধুদের বাড়ি যাচ্ছি—অনেকে আমাদের কথা ভাবেই না কিনা। বাপরে বাপ। এত মদ বিলেতেও খায় না। যেদিনই নেমন্তন্নে যাই, খিদেয় আধমরা হয়ে পড়ি। খাবার পেতে পেতেই রাত কাবার। বাবু সাহেবদের শীধুপান যে আর শেষ হতে চায় না। এ কোন্ দেশী কলকাতা রে বাবা! এই লোকগুলোকেই তো আগেও চিনতুম, তারা তো ঠিক এমনটি ছিল না।

ছোটো পিসি বললে—"রোববার আমাদের বাড়িতে লাঞ্চ খাবি, তোর সঙ্গে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের আলাপ করিয়ে দিতে ইচ্ছে।" বাড়িতে খেতে বলছে শুনেই উৎসাহ হলো। তা ছাড়া, ছোট পিসিরা শুনছি বিরাট বড়লোক—আলিপুরে (ওল্ড! অফ কোর্স!) চওড়া কাঠের পালিশকরা সিঁড়ি, মার্বেলের গাড়িবারান্দা, সবুজ লনওলা

সায়েবী বাড়িতে থাকে। কেবল বসবার ঘরেই নাকি তিন-তিনটে এয়ার কণ্ডিশনর দুজন লোকের জন্য। বয়বাবুর্চি পাঁচজন। বাথরুম ছটা। উর্দিপরা পাগড়ী বাঁধা ড্রাইভার। গাড়িটা অবশ্য এয়ার কণ্ডিশনড নয়, তবে পাখা লাগানো। গেটে ভোজালী-আঁটা নেপালী দরোয়ান।

দরোয়ান অবশ্য ছোট পিসের ঠিক নিজস্ব নয়, অফিসের। আর ভোজালীটা দরোয়ানের। বাড়িটাও ছোট পিসের ঠিক নিজস্ব নয়। অফিসের। এয়ার কণ্ডিশনর-গুলোও তাই। গাড়িটাও। গাড়ির অপূর্ব পাখাটাও। বয়-বাবুর্চি-ড্রাইভার-জমাদার কোনটাই ছোট পিসের ঠিক নিজস্ব নয়, মায় তাদের উর্দিগুলো পর্যন্ত না। কেবল ছোট পিসিটি ছাড়া বাকি যা কিছু, সবাই ছোট পিসের অফিসের সম্পত্তি। রিটায়ার করলেই ব্যস্! কোথায় বা কি ভূতের ফাঁকি মিলিয়ে যাবে ফট করে। তাই সময় থাকতে থাকতে এই বেলা একটু দেখিয়ে-চাখিয়ে নিতে না পারলে ছোট পিসিরই বা ভালো লাগবে কেন? "নিশ্চয়ই যাব" বলে কথা দিলুম।

কিন্তু কপালে নেই; কথা দিলে কি হবে! পর পর অতো নেমন্তন্ন খাবার ফলটি ফলল। রবিবার সকাল থেকেই পড়লুম। বেলা সাড়ে এগারোটায় ফোনে পাওয়া গেল ছোট পিসির বাড়ি— বেয়ারা ধরল এবং বলল 'মেমসাব বাগবাজার মে"। বাগবাজারে আমাদের পুরনো বাড়ি। জ্যাঠামশাই এখনও ওখানে। আজ বাড়িতে খাওনদাওয়ান—এখন ছোট পিসি বাগবাজারে? মানে? "কখন ফিরবেন?"

—"সামকো লৌটেঙ্গে।"

আমি যত বলি—'হতেই পারে না, তোমাদের বাড়িতে আমার লাঞ্চের কথা।"

বেয়ারা তত সবিনয়ে বলে—"হাঁ জী, ইধর লাঞ্চ তো জরুর হ্যায় আপকা—লেকিন মেমসাব বাগবাজার মে।" চটেমটে আর ছোট পিসেকে ডাকলুমই না। দূর ছাই! আজ আমি যে যেতে পারছি

না, সেটা বেয়ারাকেই জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলুম। ব্যাপার কিছুই বুঝলুম না। আমাকে খেতে নেমন্তন্ন করে ছোট পিসির বাগবাজারে চলে যাবার মানেটা কী?

…আশ্চর্য! মানে বোঝা গেল পরদিন। ছোট পিসিই এসে হাজির, সকালের দিকে। অসুস্থ আমাকে দেখতে। এসে ছোট পিসি যে গল্পটা বলে গেল আপনাদের হুবহু সেটাই বলছি। বিশ্বাস-করা-না করা আপনাদের ব্যাপার। অতঃ ছোট পিসি উবাচ :

…"তোকে তো লাঞ্চে ডাকলুম। তারপর তোর পিসের গেস্টদের লিস্টি দেখেই আমার মেজাজ টং হয়ে গেল। দেশ-বিখ্যাত ব্যক্তি একজন। এঁরা একসঙ্গে পদধূলি দিলে বাড়ির যে কী অবস্থা হবে তা ভালই বুঝতে পারছি। পূর্ব অভিজ্ঞতা তো কম নেই। তার মধ্যে তুই এলে তোর কী অবস্থা হবে, তাও! এখন তোকেই বা বারণ করি কী করে? সুতরাং রান্নাবান্নার বন্দোবস্ত করে, বাবুর্চিকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমি কেটে পড়লুম। সোজা ট্যাক্সি নিয়ে বাগবাজারে। যঃ পলায়তি স জীবতি। রাগ করিস নি। তোর কথা মনে করে আমার একটা দুঃখু দুঃখু ভাব হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তবুও বাড়িতে থাকতে সাহস হল না। শুনলেই বুঝবি কেন হল না।

লাঞ্চ কেন, চায়ের বেলাও পার করে দিয়ে, সাতটা নাগাদ তো ফিরলুম, কেননা রাত্রে ওর এক কোলীগের বাড়িতে আটটার সময়ে ডিনারের নেমন্তন্ন। নিচে থেকেই ভুরভুরে গন্ধ, আর রেকর্ডের বাজনা শুনতে পেলুম। বুঝলুম ব্যাপার সুবিধের নয়। ভেবে দ্যাখ্ তুই, সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে। আর অতিথিরা এসেছেন বেলা বারোটার আগেই। দারোয়ান বললে,—"মেমসাবলোগ সব ঘর চলা গয়া, লেকিন সাবলোগ কোই কোই হ্যায়।" স্ত্রীরা সবাই চলে গেছে, কিন্তু স্বামীরা কেউ কেউ আছে, জেনে রাখবি, এটা মহা দুর্লক্ষণ! এর নাম এক্সপেন্স একাউন্ট। সন্ধ্যে সাতটার পরেও লাঞ্চ!

ভয়ে ভয়ে ওপরে উঠে ঘরের পর্দা তুলেই দেখি চিত্তির। ঘরের মধ্যিখানে কলকাতার বিখ্যাত চারটে মাতাল। একজনের হাতে উঁচু

করে ধরা একটা বোতল—অন্যেরা সেইটে কেড়ে নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। আর তোমার পূজনীয় ছোট পিসে তাদের ঠিক মধ্যিখানে, গোপিনী পরিবেষ্টিত কেষ্ট ঠাকুরের মত দাঁড়িয়ে। হাতে বাঁশির বদলে একটা গোল করে পাকানো বিজনেস স্ট্যানডার্ড নাকি ফিনান্সিয়াল টাইমস্—কে জানে সেটা দিয়ে হন্যে হয়ে একে ওকে মাঝে মাঝে দু' এক ঘা পেটাচ্ছেন। এই হচ্ছে ওঁর মাতালদের মারামারি থামানো—যেভাবে লোকে কুকুর বেড়ালকে ট্রেনিং দেয়, অনেকটা সেইভাবে। কিন্তু মাতালরা তো আর কুকুর বেড়াল নয়, তারা ওতে শুনবে কেন? তাদের টেম্ করে কার সাধ্যি? ঘরের কোণে বড়ো হরি বেয়ারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে।

সন্ধ্যে সাতটায় বাড়ি ঢুকে এই দৃশ্য দেখেই তো, আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল, রগ দপ্ দপ্ করতে লাগল। আমাকে দেখেই তোর ছোট পিসে হঠাৎ কাত্‌রে উঠলেন—"এই যে! এসেছ? এস! এস!—ত্যাখো তো, কী কাণ্ড!" যেন এইমাত্র নন্দনকানন থেকে পড়লেন—যেন জীবনে কখনো মাতাল দেখেননি। আমাকে ত্যাখামাত্র সমবেত মাতালদের প্রত্যেকের অভিমান ষোল কলায় উপচে উঠল।

—বৌদি। দেখুন না, ভট্‌চায্যি কী করছে—

—কী করছে মানে? কে পি আমার হাত টেনে ধরে রেখেছে—ছাড়ছে না!—ছাড়ো বলছি,

—মিসেস রে, প্লীজ টেল্ সুরিন্দর টু লীভ মাই বটল—

—মিসেস রে, লুক অ্যাট ত্যাট রেচ্; দেশাই—হি হ্যাজ গ্রাবড মাই বট্‌ল—

—বৌদি, কে পি-কে বলুন তো, আমার হাত ছেড়ে দিক—

—কেন ছাড়বো? আগে সে আমাকে আপনি বলুক!—বলো, "ছেড়ে দিন"—

—বলব না।

—ছাড়ব না।

পরিষ্কার যুক্তি তর্ক চলছে—কে বলে মাতালদের যুক্তি থাকে না?

হঠাৎ দেখি মারামারি থামিয়ে মাতালরা গোল হয়ে সার বেঁধে এ ওর পেছনে পরস্পরের কোমর ধরে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। সেই হারীত-লারিতে জারিতের ডায়াগ্রামের মত। ব্যাপার কী? না আগের পপ্ মিউজিকের রেকর্ড পালটে গিয়ে হঠাৎ শুরু হয়েছে একটা পুরোনো হিন্দি গান—পত্‌লী কমর হ্যায়, তিরাছী নজর হ্যায়" অমনি মাতালদের মেজাজও বদলে হাসিখুশি হয়ে গিয়েছে। ফোক ডান্স হচ্ছে। সকালেঃএদের পরনে ভাল ভাল পোশাকই ছিল মনে হয়, কিন্তু এখন সেগুলো ন্যাকড়ার মত। ভেবে গ্যাখ্ ধাম্‌সানো পোশাক পরা চারটে বিভিন্ন সাইজের লম্বা বেঁটে রোগা মোটা মাঝবয়েসী মাতাল গোল হয়ে থুপথুপিয়ে নাচছে—একজনের বগলে একটা বোতল। মাঝখানে আমার কত্তা।—তখনও করুণভাবে পাকানো খবরের কাগজ পেটা করে যাচ্ছেন অতিথিদের, আর সেই নৃত্যের বৃত্ত থেকে বেরুতে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। কিন্তু ওরা ওঁকে বেরুতে দিচ্ছে না। এসব দেখতে ভালই লাগছিল এমন সময়ে গানটা ফুরিয়ে গেল—হঠাৎ শুরু হল—"বোল্ রাধা বোল্ সঙ্গম হোগা কি নহী"—অমনি কী যে হল, নৃত্যরত মাতালরা রে রে শব্দে ঘুঁষি তুলে বোতল উঁচিয়ে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরে গিয়ে এ ওকে উল্টোবাগে তাড়া করল। ফোক ডান্সটা এখন আর তেমন নিরীহ নেই, হেডহান্টিং নাগাদের মত হিংস্র টাইপের দেখাচ্ছে—তোমার পিসেমশাই ভীতু মানুষ—তিনি এবার কাগজটা ফেলে দিয়ে—"উষা! আমাকে বাঁচাও!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। বিজনেস স্ট্যানডার্ড না ফিনান্সিয়াল টাইমস ওঁকে আর রক্ষা করতে পারছে বলে মনে হল না। আমি আর কী করি? ইষ্ট নাম জপ করে দুগ্‌গা বলে বডি থ্রো দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম মাতালদের সার্কেলের ঠিক সেণ্টারটা লক্ষ্য করে। জানিসই তো আমার এই বিপুল ওজনটা কখনোই বৃথা যায় না। ঝাঁপ দিয়েই বাঁ কনুই দিয়ে পরপর দুজনকে আর ডান কনুই দিয়ে আর-দুজনকে বিরাট সিকার চারটি গোঁত্তা মারতেই তারা যেই দু দিকে সরে গেল, তোর পিসেও সেই ফাঁকে ছুট্টে পালিয়ে গেলেন। ভেবেছিলুম

ওতেই মাতালরা দাঁত ছিরকুটে উলটে পড়বে, কেননা শুনেছি মাতালদের গায়ে একদম নাকি শক্তি থাকে না। কিন্তু কি বলব তোকে, একটাও উলটে পড়ল না? একটুখানি টলে গেল মাত্র। তারপরেই আবার সার্কেলটা জোড়া লেগে গেল। পানাপুকুরের মতন। একবার দেখলুম আমিই তাদের কেন্দ্রমণি, তোমার ছোট পিসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নিচে পালিয়ে যাচ্ছেন, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। আমার কনুইয়ের গোঁত্তায় মাতালরা একটাও পড়ল না বটে কিন্তু ওই যে কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো হরি বেয়ারা হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল, সে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, কাটা কলা গাছের মত ধপাস ক'রে উপুড় হয়ে সটান্ আছড়ে পড়ল কার্পেটের ওপরে। পড়েও তার ঘুম ভাঙলো না। এখন আমি এই বৃত্ত থেকে বেরুই কী করে? নেমন্তন্ন রয়েছে। হরির তো ওই অবস্থা, আর তোর পিসে পালিয়েছে! ভাবছি আবার গোঁত্তা মারবো, এমন সময়ে নিচে একটা হৈ চৈ উঠল। তার পরেই মনে হলো সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে আসছে, তোর পিসের পায়ের শব্দ নয়। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো একটি আলুথালু বাঙালী মেয়ে। হাউমাউ করে কাঁদছে, কোলে একটা কচি বাচ্চা। বাচ্চাটাও তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, তার মাও তাই। পেছন পেছন আরো একজন চেল্লাচ্ছে। সে আমাদের দারোয়ান। —"অন্দর মত্ যাইয়ে! অন্দর মত্ যাইয়ে পয়লা তো সিলিপ দিজিয়ে—" বলে। আর স্লিপ! কে শোনে কার কথা। মেয়েটা হাপুস নয়নে কাঁদছে আর বলছে···"ও মিস্টার ভটচাযি্য। ও মিস্টার দেশাই!"···আর বাচ্চাটা বলছে···"মঁ্যা······" আর করুণ গলায় দরওয়ান বলছে "সিলিপ কাঁহা"।

এদিকে ঘরের দৃশ্য ভয়ানক। এই দুশো পাউণ্ডের আমায় ঘিরে মাতালদের সে কি বেদম নাচ···যেন কোনও বারব্রত, কি স্ত্রী আচার পালন করা হচ্ছে।···"আয় আয় সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।" ওদিকে···"ও মিস্টার ভট্‌চাযি্য। ও মিস্টার দেশাই।" মেয়েটা কেঁদেই চলেছে। কিন্তু ওদের গেরাহ্যি নেই।

শেষে ডেসপ্যারেট হয়ে দিলুম একটা কনুয়ের গোঁত্তা ভট্‌চায্যির পাঁজরায়। অমনি ভট্‌চায্যি বললে···"কৌন হ্যায় ?"

মেয়েটি বললে···"আমি তো মিসেস চ্যাটার্জী"···

··· "কোন্ চ্যাটার্জী ? সৌমিত্র না উত্তমকুমার ?"

উত্তরে মেয়েটা আরো কাঁদে আর বলে······"কী আশ্চর্য ! আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি তো আপনাদেরই মিসেস চ্যাটার্জী। এবার ভট্‌চায্যি হঠাৎ রেগে গেল···"তার মানে ? আই হ্যাভ ওন্‌লি মিসেস ভট্‌চায্যি ! ব্যাস্ হামকো কেহ মিসেস চ্যাটার্জী উটার্জী নেহী হ্যায় !"···"ও মিস্টার দেশাই !···" এবার আমি দেশাইকে একটা রাম-গোঁত্তা মারলুম। তক্ষুনি দেশাই বলে উঠল···"হুইচ্ মিসেস চ্যাটার্জী ? মিসেস বি কে ? মিসেস এস এন ? মিসেস জে সি ? কৌন্‌সা ?" মেয়েটা একেবারে হুহু করে কেঁদে ফেললো··· "কী মুশকিল ! আমি তো আপনাদের দুজনেরই পি এ ? চিনতে পারছেন না ? গত পাঁচ বছর ধরে রোজ ডিকটেশন নিচ্ছি ? আমি তো আপনাদের স্টেনো হই"···

···"স্টেনো তো ইধার কিঁউ ? অফিসমে যাইয়ে···ডিকটেশন উধার মিলেগা···"

—"মেয়েটি এবার কাঁদতে কাঁদতে কার্পেটে লুটিয়ে পড়লো। দেখা-দেখি ওর বাচ্চাটাও। ডিকেটেশন চাইনে স্যার, আমি হেল্‌প চাই ! আমার স্বামীর স্কুটার একসিডেন্ট হয়েছে—হাসপাতালে নিয়ে গেছে—"

—"গুড ! ফাইন ! হসপিটালমে নিয়ে গেছে— তো ? ব্যাস ! সব কু ঠিক হয়ে যাবে !"

—"ও মিস্টার ভট্‌চায্যি,—এই রাত্তিরে আমি অত টাকা কোথায় পাই—ইঞ্জেকশন রক্ত—হা ভগবান—" এমন সময়ে অকস্মাৎ "ওঃ হো ! রুপাইয়া চাইয়ে ? লিজিয়ে না—কিংনা রুপাইয়া ?" বলে মেজর সুরিন্দর সিং নিজের পকেট থেকে এক তোড়া নোট বের করে ওকে দিতে গেল। হাত কেঁপে গিয়ে টাকাগুলো সব মেঝেয় ছত্রাকার হয়ে পড়ল, কিন্তু মেয়েটি সেদিকে তাকিয়েও দেখল না। কেবলই হাত জোড়

করে বাচ্চা কোলে করে অজ্ঞান অবুঝ বস্ তুটোর কাছেই অনুনয় বিনয় করতে লাগলো সে। আমি তাড়াতাড়ি বলি—লজ্জা করবেন না, ওতে লাভ নেই। এরা সব পাঁড় মাতাল এখন,—যা পাচ্ছেন চটপট নিয়ে নিন—হরির লুট যখন দিচ্ছেই—" এমন সময় হঠাৎ—"হরির লুট! হরির লুট!" বলে ভীষণ চেঁচাতে চেঁচাতে ভট্চায্যি পকেট থেকে টাকাকড়ি বের করতে, আর কার্পেটের ওপরে ছড়াতে লেগে গেল। দেখাদেখি দেশাই আর কে পিও নেচে নেচে 'হরিবোল' বলে আহ্লাদে চাদ্দিকে টাকা-পয়সা ছুঁড়তে শুরু করলে।—মেয়েটা তো থ! আমিই কষ্টেস্ষ্টে নিচু হয়ে কুডোচ্ছি, এমন সময়ে 'হরির লুট' 'হরিবোল' ইত্যাদি শুনেই বোধহয়, শ্রীমান হরির লুপ্ত চেতনা জেগে উঠল। মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে সেও পাল্লা দিয়ে টাকা কুড়োতে থাকে। কুড়িয়ে কাঁধের ঝাড়নে ঝেড়েঝুড়ে সেগুলো যত্ন করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিতে লাগল হরি। এঘরের কর্মকাণ্ড দেখে মেয়েটা তো চুপ করেইছে, বাচ্চাটারও কান্না থেমে গেছে। মাতালদের নাচের বৃত্তও আপনাআপনি ভেঙে গেছে। আমি মুক্তি পেয়ে তাড়াতাড়ি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা হাতে তুলে নিয়ে, মেয়েটিকে বললুম—

—চলুন মিসেস চ্যাটার্জী তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন দেখি কী করা যায়। এ টাকাগুলোই এখন রাখুন, আর আপনার সঙ্গে আমি গাড়িটা দিচ্ছি, ড্রাইভারই ওষুধপত্র কিনেটিনে দেবে, যা দরকার হেল্প করবে। এঁদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন—ওকে রওনা করে দিয়ে ওপরে এসে দেখি হরি আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোচ্ছে—সব রেকর্ড ফুরিয়ে বাজনা বন্ধ।

আর তিন মাতালে মিলে লগবগ করতে করতে ফের লড়াই বাধিয়েছে সেই বোতলটা নিয়ে। চার নম্বর কে পি সিন্‌হা বেচারী মোটা মানুষ, আর লড়তে না পেরে, রেফারী হয়ে গেছে। তোর পিসে অ্যাবসেণ্ট। আমি তো ঢুকেই এক ঝটকায় বোতলটা কেড়ে নিলুম। অমনি রেফারী 'সুঁ' করে ভাঙা ভাঙা শিস দিয়ে, বলে উঠল—'গেওওলল।'

—আর আমি দেখি : হা ভগবান, এটা তো একটা খালি বোতল। এই নিয়ে এত লড়াই! এ মাতালগুলোর নরকেও ঠাঁই নেই আমার বাড়িতে তো নয়ই।—তেড়ে-ফুঁড়ে '—হরি-ঈ-ঈ' বলে ডাকতেই হরি রক্তচক্ষু মেলে, আমার সুরে সুরে মিলিয়ে—'জী-ঈ-ঈ' বলেই তক্ষুনি চোখ বুজে ফেলল। চোখের রঙটি দেখেই বুঝলুম অত ঘুম কিসের। ব্যাটা নেশাখোর! এক ধমক মেরে মিলিটারি কায়দায় বললুম.—'হরি জলদি!' —'সাবলোগকো আভি হঠাও! কুইক!' শুনে হরি চোখ বুজে বুজেই গুনগুন করে হাত নেড়ে বলে উঠলো যেন বাগান থেকে গরু তাড়াচ্ছে কি ছাগল—'হে-ই! হেট হেট!' তারপর এক চোখ মেলে আমাকেই জিজ্ঞেস করলো—'গিয়া?' আমার মুখের চেহারাতেই বোধহয় উত্তর পেয়ে গেল।

—নেহ গিয়া? আচ্ছা খতরনাক সাবলোগ? তারপরেই শিবনেত্র হয়ে বলতে লাগলো—জোরে জোরে—

—এঃ সাবলোগ, হঠ্ যা, হঠ্ যা! ঘর যা, ঘর যা! হুশ-শ্-শ্—খেপে গিয়ে আমি এবার হরিকে প্রচণ্ড ধমক লাগালাম—ও কী হচ্ছে কী? হরি? ভালো করে বলবি তো? হরি তখন ঘুঁষি পাকিয়ে ভাল করে বলতে লাগলো—

—এঃ সসালে সাবলোগ, হঠ! হঠ!—ভাগ সালে ভাগ! ঘর যা! ঘর যা! এঃ—সসসালে সাবলোগ—' আমি আর না পেরে হরিকে হিড়হিড় করে টেনে অন্দরের বারান্দায় নিয়ে এসে বললুম, 'বন্ধু, ওমনি করে নয়, হাত ধরে এমনি করে হঠাও!' বলেই, প্রেশারের ওষুধ খেতে ছুটলুম। একেই আমি ভারী মানুষ, তায় রাগলেই মাথায় রক্ত উঠে যায়—ঘাড় টনটন করছে, মাথা যেন সীসের মতো ভারী।—বাড়ি এসে অবধি মাতাল সামলাতে সামলাতেই আধমরা! ওষুধ খেয়ে স্নান করে সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে ফিরে এসে দেখি অন্দরের বারান্দায় সার সার তিন মূর্তি পড়ে আছে। একজন আবার আরেকজনের কানে কানে কী সব বলছে। নিচু হয়ে মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনি ফিসফিস করে বলছে—

—মোর লাগি করিয়োনা শোক
আমার রয়েছে কর্ম
আমার রয়েছে বিশ্বলোক—'

সেহ শুনে অন্যজন খুব জোরে ফোঁস করে ঘর কাঁপিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ভাল করে চেয়ে দেখি এটা হচ্ছে হরি। আর হরির কানে নামতা পড়ার মত করে কবিতা আওড়াচ্ছেন মিস্টার ভট্চাযি্য। ওপাশে একা শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন মিস্টার দেশাই।

ঘরে ঢুকে দেখি আরেক মনোহর দৃশ্য। ছ-ফুট লম্বা সুরিন্দর সিং চিৎ হয়ে ছোটো কোচের ওপরে শুয়ে আছে। লম্বা ঠ্যাং দুটো ভাঁজ করে হাতলের বাইরে শূন্যে ঝুলিয়ে। আর মোটা কে পি সিন্হা মেঝেয় কার্পেটে উপুড় হয়ে আছে কচ্ছপের মতো। মাঝে মাঝে কুমীরের মতো মাথা তুলে বলে উঠছে: বাট, জামাইবাবু ওয়াজ আ পারফেক্ট জেণ্টলম্যান! আর অমনি সুরিন্দর সিং জড়িয়ে জড়িয়েই ধমকে উঠছে—

—'স্যো হোয়াট?' তোমার ছোট পিসে কিন্তু ঘরে, বাইরে, কোথাও নেই। কী করি? রাত তখন ঢের। দশটা বেজে গেছে। কখন আর খেতে যাব আমরা? অনেক করে বলেছে গুপ্তরা—না গেলে খুব খারাপ দেখাবে—যাওয়া উচিত। এদিকে এঁরা লাঞ্চে এসেছেন প্রায় দশ বারো ঘণ্টা হোলো। বয়-বাবুর্চিদের ডিউটি অফ হয়ে গেছে। তারা সব বাড়ি চলে গেছে। কেবল গেটে আছে দারোয়ান, আর ঘরে হরি। হরি তো ভূমিশয্যায়। শেষের কবিতা শুনছে।

অগত্যা দরোয়ানকেই গিয়ে বললুম—'যার যার ড্রাইভারকে বল, এসে যে-যার গুণমণি মনিবকে বাড়িতে নিয়ে যাক—আউর হরি কো কান পাকড়কে উঠা দো।' বাহাদুর পায়ে পায়ে হরির কাছে গিয়ে হরির অবস্থা দেখে লজ্জায় অস্থির হয়ে প্রথমেই তো জিব কেটে ফেলল। তারপরেই হরির কানটি ধরে লাগালে এক থাপ্পড়। অমনি হরি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাহাদুরকেই বিশাল সেলাম ঠুকে বললে—'জী সাব! ব্রেকফাশ রেডি!'

দুত্তোর! ব্যাটা নেশাখোর। বাহাদুর আরেকটা থাপ্পড় কষাতেই হরির নেশা ছুটে গেল।—তখন হরি আর বাহাদুর মিলে, ড্রাইভারদের ডেকে এনে পরপর তিনটে মাতালকে তো কোনো রকমে নিচে নিয়ে গেল চ্যাংদোলা করে। কেবল হরি শুধু একবার ভুল করে বলে ফেলেছিল 'রাম নাম সৎ হ্যায়'—কিন্তু বাহাদুরের ধমকে থেমে গেল তাড়াতাড়ি। মুশকিল বাধালো মেজর সুরিন্দর।—'স্কোয়াড আগে বাঢ়—খড়-বিচালি খড়-বিচালি'—বলে শুয়ে শুয়েই এইসা পা ছুঁড়তে লাগলো, তার ধারে কাছে যায় কার সাধ্যি! তাকে ছোট সোফা থেকে নড়ানো গেল না।

এদিকে তোমার ছোট পিসেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না—রান্না-ঘর, বাথরুম ওয়ার্ডোব ক্লসেট, পর্দার পেছনে খাটের তলায়—কোথাও তিনি নেই। মহা দুশ্চিন্তায় পড়লুম। গেল কোথায় লোকটা? দরোয়ান লন-বাগান সমস্ত খুঁজে এল; সেখানেও নেই। আমার মনে কী ভীষণ অশান্তি বুঝতেই পারছিস! ফলে নিচে গিয়ে মাতালদের গাড়িতে তুলিয়ে দেওয়ার খবরদারিটাও আমাকেই করতে হোলো!

ওরা তো তিনটেকে সারি সারি শুইয়ে রেখেছে সদর দালানে, ঠিক যেন ক্রিমেটোরিয়ামে মড়াদের কিউ। একে একে গাড়িগুলো সামনে এসে দাঁড়াবে আর মাননীয় অতিথিদের আড়কোলা করে তাতে তুলে তুলে দেওয়া হবে। হরি আর দরোয়ান রেডি। ড্রাইভাররা গেল গাড়ি আনতে।

প্রথমেই এলো দেশাইয়ের গাড়ি। দেখি তার পেছনে বুটটার ঢাকনি আলগা হয়ে উঁচুমত হয়ে রয়েছে, ঢকঢক করে উঠছে-পড়ছে গাড়ি চললে। ড্রাইভার যেই ভাল করে বন্ধ করবে বলে ঢাকাটা তুলেছে অমনি কী হলো, ভাব দিকিনি? জ্যাক-ইন-দ্য-বক্সের মত বুটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তোমার পুজ্যপাদ পিসেমশাই। ভাল জামা-কাপড় সব ভীষণ নোংরা, গাড়ির তেল-কালি-গ্রীজ মাখা। বেরিয়েই চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা তিন মূর্তিকে সামনে দেখে উনি চমকে উঠে—মন্মার্ডার! মন্মার্ডার!' বলতে বলতে দৌড়ে সিঁড়ির তলায় ঢুকে

পড়লেন। আগে তিন মাতালকে পার করে তারপর তোমার পিসেকে তো সিঁড়ির তলা থেকে টেনে বের করলুম। অমনি নিজের পকেট থেকে ইস্ত্রি করা সেন্টমাখা সিল্কের রুমাল বের করে টাক থেকে মাকড়সা-সমেত মাকড়সার জাল ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে তোমার পিসে খুবই সহজ গলায় বললেন—কী গো? গুপ্তর বিয়ের অ্যানিভার্সারিতে যাবে না?'—গুপ্ত তোর পিসের কোলীগ—ওদের মধ্যে যেমন ভাব, তেমনি আবার একটু রেষারেষিও আছে; না গেলেই ঠিক দোষ ধরবে। দামী একটা প্রেজেন্ট কিনে রেখেছিলুম। এত কাণ্ডের মধ্যেও ঠিক ওঁর সেটা মনে আছে। এইসব সখের মাতালেরা কিন্তু 'ঠিকেয় ভুল করে না, বুঝলি?

—'আমি তো রেডি? কিন্তু রাত্তির এগারোটা কখন বেজে গেছে—এখন কেউ নেমন্তন্ন যায়?'

—'খুব যায়' বলে উনি ঘরে চলে গেলেন। হাত মুখ ধুয়ে ফর্সা হয়ে পাটভাঙা পোশাক পরে এসে, ছোট সোফায় সুরিন্দরকে ঘুমোতে দেখে তোর পিসের সে কী আহ্লাদ। 'আরে? সুরিন্দর বাড়ি যায়নি? বাঃ! চলো, চলো, ওকেও নিয়ে যাই গুপ্তর বাড়ি।' আমি বজ্রকঠিন হয়ে বললুম—'না! ওকে একদম ডিস্টার্ব করবে না! ও থাক যেমন আছে!' বলে সুরিন্দরের গায়ে তাড়াতাড়িতে টেবিল ক্লথটা চাপা দিয়ে রেখে নেমে গেলুম। ঘড়িতে তখন বারোটা বাজছে।

নিচে এসে দেখি ড্রাইভারও নেই, গাড়িও নেই। কোথায় গেল? বাহাদুর আমাকে ফিসফিসিয়ে বললে, সেই যে, মিসেস চ্যাটার্জিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটোছুটি করছে! এখনও ফেরেনি। এক শিখ ট্যাক্সিওলা তার গাড়িতে দরজা খুলে ঠ্যাং দুটো বের করে ঘুমোচ্ছিল ঠিক গেটের উলটো দিকে। বাহাদুর দৌড়ে গিয়ে তাকেই ধরে আনলো। সে নাকি ওদের বন্ধু। সর্দারজী তো এন্তার পাঞ্জাবি ভাষায় গাল পাড়তে পাড়তে মিটার ডাউন করলো। আমি উঠে বসলুম। বগলে প্রেজেন্ট। তোমার ছোট পিসেও উঠতে যাবেন ঠিক এমন সময়ে আমাদের গাড়ি ফিরল। ড্রাইভার যেই নেমেছে উনি অমনি টপ

করে লাফিয়ে তার সীটে উঠে বসলেন—আর বসতে না বসতেই হঠাৎ ঘড়ি দেখে— 'ঈশ্‌শ! কী ভয়ংকর লেট হয়ে গেছে—' বলে স্টার্ট দিয়ে, শোঁ করে একাই বেরিয়ে চলে গেলেন। বাহাদুর আর ড্রাইভার হাঁ করে চেয়ে রইল। আমি তাড়াতাড়ি বললুম—'সর্দারজী। জলদি চালাও জোরসে! উস ডাকুকো পাকড়ো, মেরা হ্যাণ্ডব্যাগ লেকে ভাগ গিয়া।' কথাটা সত্যি। আমি মোটাসোটা মানুষ, শাড়ির কোঁচা-আঁচল সামলে, বগলে প্রেজেণ্টের বাক্সো আঁকড়ে, ব্যাগটাকে আর ধরতে পারিনি, ওঁর হাতে ধরতে দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেছিলুম। উনি আমার ব্যাগসুদ্ধই গাড়িতে উঠে হাওয়া।

আর যাবে কোথায়। মুহূর্তেই সর্দারজীর ঘুম উড়ে গেল। ডাকু পাকড়ানোর জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে সর্দারজী আমাকেও উড়িয়ে নিয়ে চলল। কখনো তোর পিসে আগে যান, কখনো আমরা আগে যাই—ওঃ সে কী দারুণ এক্সাইটমেণ্ট, অনেকটা হিন্দি ছবির মোটর-চেজ সিকোয়েন্সের মতো। যেন দেবানন্দ আর জিনৎ আসলে রেস দিচ্ছে। কিন্তু আলিপুর পাড়ার রাস্তাঘাট তো জানিসই—খাঁ খাঁ করছে। কেবল পথের কুকুরগুলো বেজায় চীৎকার জুড়ে তাড়া করলো আমাদের; অমন একটা সীন কিন্তু দর্শক বলতে ছিল শুধু ওরাই। এই যা দুঃখু। যাক, চকিতেই গুপ্তদের বাড়িতে এসে গেলুম। উনি গাড়ি থামিয়ে যেই নেমেছে, নামবামাত্তর সর্দারজীও—ডাকু হ্যায়! ডাকু হ্যায়!—'পাকড়ো, পাকড়ো' বলে বিরাট শোরগোল তুলে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে গিয়ে তোর পিসের গর্দান চেপে ধরেছে। ঘাড়টা ধরেই এক থাপ্পড়। উনি বেচারী মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিলেন, ভাগ্যিস আমি নেমেছিলুম? তাড়াতাড়ি ধরে ফেললুম। সর্দারজী তখন তোমার পিসেকে বজ্রমুষ্টিতে পাকড়ে, ওঁর হাত থেকে আমার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে বলল—'শালা ডাকুকো আভি আলিপুর থানামে লে যানা হ্যায়! চলিয়ে মেমসাব—'

ইতিমধ্যে তোমার ছোট পিসেও সংবিৎ ফিরে পেয়ে সর্দারজীর কলার চেপে ধরে হুংকার দিলেন—ডাকু? কোন শালা ডাকু হ্যায়? তুম? না হাম? তুম থাবড়া মারকে হামারা ওয়াইফকো ব্যাগ ছিনতাই

কর লিয়া—চলো, আভি চলো আলিপুর থানামে—সে কী কেলেংকারী! দুজনেই দুজনকে আলিপুর থানাতে নিয়ে যাবে বলে টানাটানি, ট্যাক্সির মিটার এদিকে বেড়েই যাচ্ছে। আমি একবার সর্দারজীর হাত ধরে কাকুতি মিনতি করি, আর একবার তোমার পিসের হাত ধরে। কেউই কোনো কথা শুনবে না। যাক, শেষ পর্যন্ত সর্দারজীকে অতিকষ্টে শান্ত করা গেল। সর্দারজী যখন—'শালা বাংগালী লোককো তামাশামে গোলি মারো'—বলে গাল পেড়ে আমার ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেল, তখন হাঁফ ছেড়ে আমরা গিয়ে গুপ্তদের কলিং বেল টিপলুম। রাত একটা বেজে গেছে।

আশপাশের সব ফ্ল্যাটেই তখন বিয়ে বাড়ির মতো আলো জ্বলে উঠেছে—বারান্দায় বারান্দায় লোকজন গিজগিজ করছে। গুপ্তরাই কেবল গহন ঘুমে অচৈতন্য। যতই টুংটাং করে বেল বাজাই দরজা আর খোলে না। অবশেষে ধপাধপ দোর ঠ্যাঙাতে গুপ্ত সাহেব 'হু ইজ ইট' বলে দু-ইঞ্চি দোর ফাঁক করে উঁকি মারলেন—হাতে একটা বেঁটে খাটো লোহার ডাণ্ডা। পরনে হলদে বেগুনী স্লিপিং সুট। আমাদের দেখে তো খুবই খুশি। একগাল হেসে আহ্লাদে ডাণ্ডা নাড়তে নাড়তে স্বাগত জানালেন—'বাঃ! তোমরা? এসে গেছ তাহলে? এসো! এসো! হাউ সুইট অফ ইউ! আমরা বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—' বলতে বলতে ডাণ্ডাটা দরজার কোণে গুঁজে রেখে ড্রেসিং গাউন পরে এলেন। এবং মহা যত্নআত্তি করতে শুরু করে দিলেন। তোর ছোট পিসে তো সঙ্গে সঙ্গেই আরেক প্রস্থ স্কচ আর সোডা নিয়ে বসে গেছেন। এদিকে রুমা, মানে মিসেস গুপ্ত আর আসে না। আমি আমার আপেলের জুসটি হাতে করে বসেই আছি! বসেই আছি! শেষে গুপ্ত এসে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'তুমি নিজে একটু চল তো উষা—রুমাকে আমি কিছুতেই কনভিন্স করাতে পারছি না, ও কেবলই বলছে—'ইয়ার্কি' মেরো না, যাও, আমি যেই খাটের পাশে গিয়ে ডেকেছি, "হ্যাপি অ্যানিভার্সারি, রুমা" অমনি সে উঠে বসে চোখ গোল গোল করে বললে—'এ্যাঁ? তোমরা সত্যি সত্যি

এসেছ ? এই মাঝরাত্তিরে ? কী মুশকিল ! সরি, কী আনন্দ ! ওঃ—থ্যাংকিউ। থ্যাংকিউ'—বলে দেঁতো হেসে প্রেজেণ্টটা নিয়ে, খাট থেকে নামলো। তারপর বললো—'ও, তোমরা বুঝি অন্য কোথাও নেমন্তন্ন খেয়েদেয়ে এলে ?'

শুনে আমি তো থাপ্‌পা !

—"অন্য কোথাও মানে ? তোমাদের এখানেই তো আমাদের আজ নেমন্তন্ন ?"

রুমা বললে—"সে তো আটটার সময়, আর বাড়িতে নয় তো, ক্লাবে ! ক্লাবেই তো ডিনারে ডেকেছিলুম তোমাদের সবাইকে।"

আমি করুণ সুরে বললুম—"তাই নাকি ? ভেরি স্যরি ! আসলে আমাদের বাড়িতে আজ লাঞ্চ ছিল কিনা কয়েকজনের, তাঁরা এইমাত্র গেলেন"। রুমা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল :

—"লাঞ্চ ? না ডিনার ? কী যে বল !"

—"লাঞ্চই।—কিন্তু আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে ভাই রুমা ? তোমার ফ্রিজে কী কী আছে, দেখি ?"

ব্যাজার মুখে ফ্রিজ খুলে রুমা গড়গড়িয়ে বললে—"ডিম, বেকন, মুসুম্বী, দুধ, রুটি, চীজ, মাখন—"

—"দূর, আমরা কি ব্রেকফাস্ট খেতে এসেছি ? তার চেয়ে বরং লুচি ভাজো, বেগুন ভাজো—"

চোখ কপালে তুলে রুমা বলল—"এ—খন ? লুচি ? ঘরে ময়দাই নেই ? ঘি-ও নেই।"

মনে মনে বললুম—তা থাকবে কেন ? কেবল স্কচ আর সোডাই আছে ! যেটা যাবে এক্সপেন্স অ্যাকাউণ্টে ! সেই যে হরি বলেছিল না,—"ব্রেকফাশ্‌ রেডি !" সেটা যে এমনি সত্যি সত্যি ফলে যাবে তা কে জানত ? যখন আমরা মাঝরাত্তিতে দুধ কর্নফ্লেক্স টোস্ট ডিম নিয়ে খেতে বসলুম, টেবিলে মাথা রেখে রুমা বেচারী ঘুমোতে লাগল। অথচ তার স্বামীকে একবার ছাখো ? গুপ্তর এমনই ভাবখানা—যেন এমনটাই হবার কথা ছিল। এত ভদ্র।

নিজেই কফি করে দিলেন রাত দুটোর সময়। হাসিমুখে। তোর পিসে অমন পারতেন ?

তারপর আজ সকালে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে "অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি" চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন—"উষা ? আমরা যখন গুপ্তর বাড়িতে গেলুম, তখন ড্রাইভার কোথায় ছিল ?"—আমি ওঁকে সব ঘটনা বললুম। মিসেস চ্যাটার্জীর কথাটা শুনে ওঁর কী মন খারাপ। তক্ষুনি উঠে পড়ে—"যত তো ব্যাটা মাতালের কাণ্ড !" বলে মুখ বেঁকিয়ে, বেড-টী পর্যন্ত না খেয়ে ড্রাইভারকে ডেকে সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসপাতালে ছুটলেন তার খোঁজ করতে। সত্যি গরীবদুঃখীর প্রতি ওর ভারী মমতা কিন্তু জানিস্ ?

উনি তো বেরুলেন, আমি ওঘরে গিয়ে দেখি সুরিন্দর নেই। ছোট সোফায় কেবল টেবিলক্লথটাই পড়ে আছে। আর টেবিলে একটা চিঠি চাপা দেয়া। তাতে লেখা : "ডাজ এনিবডি নো, হোয়াট হ্যাপেনড টু মাই মানি ?"

আটটা বাজতেই ভদ্রতার অবতার দেশাই ফোন করল—"গুড মর্নিং মিসেস রে, ডিড ইউ স্লীপ ওয়েল ?" তারপর একটু আমতা-আমতা করে—"স্যরি অ্যাবাউট লাস্ট নাইট !" তারপর আরো আমতা-আমতা করে—"আই হ্যাভ এ ফানি ফীলিং ইউ নো ? আচ্ছা, কাল ওবাড়িতে মিসেস চ্যাটার্জী বলে কি কেউ এসেছিলেন ?" এসেছিলেন শুনে দেশাই ফোনেই প্রায় কেঁদে ফ্যালে আর কি !—"সত্যি ছি ছি ছি, কী লজ্জা ? কী লজ্জা ! কোন্ হাসপাতাল বলতে পারেন ? আমি এখুনি সেখানে যাচ্ছি—এর হে হে, হোয়াট্ আ শেম।"

তারপর, সোয়া আটটায়, ভট্টচায্যি।—"কি ? বৌদি নাকি ? সত্যি বৌদি কাল বড্ড অত্যাচার করা হয়ে গেছে আপনার ওপরে। ছোট ভাইটি বলে মাপ করে দেবেন ! আচ্ছা, ভট্টচায্যি ইস্কুলে ছোড়দার সঙ্গে পড়ত আমার "ছোট্ট ভাইটি" হল কী করে ? সে যাকগে—তারপরেই—দাদা কোথায় ? এত ভোরেই বেরিয়েছেন ? এঁ্যা। হাসপাতালে ? মিসেস চ্যাটার্জী ?—কী সর্বনাশ ! তাহলে ওটা স্বপ্ন

নয়? আমি তো ভাবছি একটা বাজে নাইটমেয়ার দেখেছি, ঈ-ঈ-ঈশ্‌—ছি ছি ছি! কী কাণ্ড বলুন তো? আই মাস্ট গেট দেয়ার ইম্মিডিয়েটলি! ধুত্তোর। শালা মদ আর জীবনে ছোঁব না! স্যরি বৌদি—এক্সকিউজ মি—আচ্ছা কোন্ হস্‌পিটাল বললেন?"

সোয়া নটায় তোমার ছোট পিসে ফিরে এলেন। হরি চিরাচরিত গম্ভীর মুখে ট্রে নিয়ে হাজির, "সাব, ব্রেকফাশ্‌ রেডি!" উনি খেতে বসে বললেন—"চাটুজ্যের পো এ যাত্রা বেঁচেই গেল মনে হচ্ছে। দেশাই আর ভট্‌চায্যিকে ওখানে দেখলুম। খুবই কনসার্নড হয়ে ডাক্তার-নার্স ছুটোছুটি করছে।"

. তোর পিসে অফিসে রওনা হয়ে গেলেন। সেই গাড়িতেই আমি তোর কাছে চলে এলুম। এবার বুঝে ছ্যাখ দিকি, কালকে আমি বাগবাজারে গিয়ে বসেছিলুম কেন?

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছোট পিসির কাহিনী শুনছিলুম—জেগে উঠে তাড়াতাড়ি বললুম—"খুব বুঝেছি, ছোটপিসি!" তৃপ্ত হয়ে ছোট-পিসি বললেন—"তা যাকগে, এ রোববার তো তোকে খাওয়ানো হোলো না, সামনের শনিবার বরং, ডিনারে—"

আমি হাঁ হাঁ করে বলে উঠলুম—"কিন্তু ছোটপিসি। আমি বোধহয় শুক্কুরবারই দিল্লি চলে যাচ্ছি—বরং সামনের বারে খাবো, কেমন?"

॥ খেসারৎ ॥

"হাই! মা! মা রে! মা গ!"

মা চুপ করেই থাকে। সুফল যে বুকের ওপ'র আছড়ে পড়ে এত ডাকছে কানে শুনতেই পায় না। ওপাশে শুয়ে আছে লক্ষ্মী। মনে হচ্ছে সারাটা মুখ যেন সিঁদুরে মাখামাখি (ঠিক যেমন ছিলেক বিহার দিন্‌কে)। লক্ষ্মী পাশেই হাঁ করে আছে বড়্‌কা। সুফলের ঠাকুদ্দা। এতদিনে গেল। (লিজের বউ খাইছোঁ, পুত খাইছোঁ, বুড়া ঢ্যার ঢ্যার করিছোঁ) ছেলের বউ নাতির বউ দুজনকে দু'বগলে নিয়ে। (সালো বড়্‌কা মাঝি তীথির কোয়া ইবার সুমায় হৈল তুমার ?) লক্ষ্মীর পেটের দিকে তাকায় সুফল। পেটটা অল্প উঁচু হয়েছিল। (গেল। উটোও গেল। সুফল ইবার যিথাক ইচ্ছা সিথাক যেইতো পারবেক। সুফলের বাধাবাঁধন লাই)।

"হা রে কপাল। কেনে এইসেঁছেলম মত্তে লুভে পইড়োঁ গ! টুগদি সবুর সইলেক লাই—হাই মা! তুর তস্ সইলেক লাই!"

ওদের গাঁ থেকে শহর অনেক দূর। সেখানেও হাসপাতাল আছে বটে, কিন্তু সুফল দেখেনি। সুফলের হাসপাতাল দেখা এই প্রথম। যেমন কলকাতা শহর দেখাও এই প্রথম।

হাসপাতাল কী বিচিত্র ঠাঁই!

চতুর্দিকে কেবল মরা আর আধমরা মানুষ ভর্তি। আর সাদা জামা পরা জুতো পরা যমদূতের মতন সব মেয়ে মরদ খট্‌খট্ করে ঘুরছে। সবাইকে ধমকাচ্ছে। মাথায় সাদা ফেট্টি বাঁধা একটা মেয়ে-মানুষ এসে সুফলকে মায়ের বুক থেকে হটিয়ে দিল, আরেকটা মরদ এসে ফটাফট চাদর চাপা দিয়ে দিল তিনটে মানুষের ওপর। একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে। (এত গরম। বাপ্‌রে। জানপরাণ যায়, গা'র ছাল্‌টো যেন ছেইড়োঁ, ইর ভিত্‌রি চাদর চাপা ?) একলা

সুফলই রইল চাদরের বাইরে। সুফলের পরনে ফর্সা ধুতি। গায়ে ফর্সা গেঞ্জি। গলায় পেতলের মাদুলি। মাথায় ভিজে চুল পাট পাট করে আঁচড়ানো ছিল একটু আগেও। (সুফল এখন যিথাকে ইচ্ছা সিথাক যেইতোঁ পারিস। ঘর্‌কে যাবি? কার ঘর্‌কে যাবি রে সুফল?) অমনি আরেকটা চাদরের তলায় ঢুকে পড়তে পারলেই সবচেয়ে ভালো হতো সুফলের এখন।

"লক্ষ্মী রে! হাই রে লক্ষ্মী! মোখে ছেইড়েঁ্য তু কুথাক্ চললি রে!" সুফল হঠাৎ শানবাঁধানো মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকতে আরম্ভ করে দেয়।

—"এই! ও কী হচ্ছে কী? মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা হবি যে?"

ডাক্তারবাবুটা এসে ধমক লাগায়। গেঞ্জীর কোণা ধরে টেনে তোলে।

"বাবু! মোর সব যেছেঁ সব চইল্যোঁ যেছেঁ গ'! সহ্য করতে লারছি।"

"সব গেছে মানে? কী গেছে তোর?"

"মা যেইছেঁ, বউঠো যেইছেঁ, বউয়ের প্যাটের ছেইল্যাতো যেইছেঁ, বুড়া কত্তা যেইছেঁ—হারে মোর কপাল!" ঠাস্ ঠাস্ করে মাথায় থাপ্পড় মারে সুফল।—"হাই বাবু গ' আমি ঘরকে যাব কেম্‌নি করেঁ্য গ'? গাঁকে যেইয়েঁ্য পুড়া মুকখান দিখাব কেম্‌নি করেঁ্য গ' বাবু? পুড়া ঘরকে যে জনমনিষি রইলেক নাই!"—সুর করে কাঁদতে থাকে সুফল। ছোকরা ডাক্তারবাবুটার মুখখানা কেমন যেন হয়ে যায়।

"দাঁড়া, দাঁড়া, চুপ কর্। আগে আমায় বুঝতে দে। কে কে গেছে তোর বললি? মা? বউ?" বাবুটা কাগজ পেন্সিল বের করে।

মা যেছেঁ, বউটো যেছেঁ, বউয়ের প্যাটে ছেইল্যাটো যেছেঁ, বুড়াকত্তা যেছেঁ—আমি জেন্মেঁওন্মেঁ কুখুনো তো পাপ করি নাই—হাই বাবু গ'—মোর ঘরকে আর কেউ নাই রে বাবু—কেউ কুত্থাকে নাই কে নে রে আমার!" হাউমাউ কাঁদতে থাকে সুফল।

—"নাম কী তোর?"

—"সুফল মাঝি! অ বাবু, মোর কী হবেক রে—"

—"চুপ কর্—গাঁয়ের নাম? গাঁয়ের নাম কী তোর?"

—"গেরাম কুন্তঙ্গেরাম, থানা ইলমবাজার, জিলা বীরভূম—"

—"ওঠ্, ওঠ্—আয় আমার সঙ্গে—"

—"কুথাকে যেইত্যেঁ হবেক গ' বাবু? শ্মশান কে?"

—"সেসব এখন নয়। ঢের দেরি আছে শ্মশানের। চল্ তোর নামঠিকানা লিখিয়ে দিবি চল্। শালা ড্রাইভারগুলোর ফাঁসি হওয়া উচিত। না আছে কন্ট্রোল, না হয় গাড়ির মেনটেনেন্স। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকেও রক্ষে নেই? ছি, ছি, ছি—"

তিনটে মড়ার মুখাগ্নি করা সোজা ব্যাপার নয়। মুখে আগুন মানে মায়া কাটানো। তা মায়াটা বেশ ভালোভাবেই কেটে গেছে এবার সুফলের। কত্তাবুড়া। মা, লক্ষ্মী। বেরিয়েছিল মোট চারজনেই। ঘর বন্ধ করে, ছাগল চরানোর ভারটা চাঁদু বধুনীর ওপরে দিয়ে।

"মিটিন্ আছেক। কইলকাথার ময়দানকে বড়িয়া মিটিন্। পার্টির দাদাবাবুরা গাড়িভাড়া দিয়েঁ্য লিয়েঁ যাবেক, ভাত দিবেক, লিথরচায় কইলকাথা দেইখ্যেঁ আসবি সব্বাই—গঙ্গাচ্ছান কইরেঁ্য আসবি সব্বাই—" সিদুখুড়া বলেছিল। তারই কথায় এসেছে ওরা তেরোজন, ময়দানে মিটিং করতে আর ঐ সঙ্গে লিথরচায় কলকাতা শহর দেখে যেতে। মা বললে,

"মুন বুলছেক ইবার না হলিঁ্য আর কুনুদিন হবেক লাই। মোর গঙ্গা দিখা হয় লাই রে সুফল। একটুস ডুব দিয়েঁ্য আসথম্।" লক্ষ্মী বললে,—

"মা যাবেক, তবে মোকেও লিয়েঁ্য যাবি কিন্তুক, হঁ! বুল্যেঁ দিলম! ইকা ইকাটি ঘরকে থাকব লাই।" তারপর আড়ালে আহ্লাদী গলায় বলেছিল।

"কইলকাথাক যেইয়েঁ্য চিড়েখেনাটো দিখাবি, সুফল? বাঘ, সিঙ্গি, হাতী, বান্দর? ফুলটুসি সব দেইখ্যেঁ এসেছেক রে!"

"বেশ, বেশ। সব হব্যেঁ।" বড়্কা মাঝি বলেছিল।

"পয়লা ইস্টিশানকে নেমেঁ্য গঙ্গাচ্ছানটো সেইর‍্যো লিব, তাপ্‌রে সিধা কালিঘাট। পূজাটো দিইয়েঁ্য, চিড়েখেনাক লিয়েঁ্য যাব তুদেরখে। তাপ্‌রে মিটিং। বাস্‌। মিটিনকে যেইলিঁ তো পুরা শহরটো দেইখেঁ্য লিলি। মইদান, মানুম্যাণ্টো, ভিট্টরিয়া। আর ভীড় কী! বাপ্‌ গ'!"

অমন জমজমাট প্রোগ্রামটার কেবল শুরুটুকুই হয়েছিল। শেষটা অন্যরকম চেহারা নিল। ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে প্রত্যেকেই গঙ্গাস্নান গঙ্গাপুজো করেছে। এখন ট্রামে চড়বে বলে দাঁড়িয়েছিল সবাই হাওড়ার পুলের উপরে। কলকাতা এসেছে ট্রামে চড়তে হবে না? প্রথমে কালিঘাট। তারপরে চিড়িয়াখানা।

উঃ! কী শহর! গাড়িঘোড়ার দাপট কী! বড় শহর সিউড়িও দেখেছে সুফল মাঝি। তার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না।

"গাড়িগুলান সব ঝেনে উদ্ধ্বশ্বাসে দাঁতুড়ে আসছেক—" ভয় পেয়ে লক্ষ্মী বলে উঠেছিল—

"উঃ! জান্‌টো লিয়েঁ্য লিবেক নাকি? বাপ্‌ গ'!"

তাই হয়েছে। ঠিক তাই হয়েছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়েছিল তেরোজন গ্রামের মানুষ, ভোরবেলা স্নান সেরে। ব্রেক নষ্ট সরকারী বাস পাগলের মতো হুদ্দাড় করে ফুটপাতে উঠে এসেছে; সাতজনকে চাপা দিয়ে জান্‌গুলো এক্কেবারে নিয়েই নিয়েছে। তিনজন সুফলেরই ঘরের মানুষ। বাকি চারজন ডোমপাড়ার। আরো তিনজন হাসপাতালে ভর্তি। বেঁচে গেছে সুফল, পঞ্চা, সিদুখুড়া। ওদের আর মিটিনে যাওয়া হয়নি। (সুদ্ধা মা গঙ্গা আর হাওড়ার পুলটো আর হাসপাতাল। বাস। আর কুছুটা দেখলম্‌ লাই)!—"লক্ষ্মী রে! আই রে লক্ষ্মী! চিড়েখেনাক বিড়াতে যেইতেঁ্য বড্ড সাধ হইছিল রে তুর্‌—॥

—"আবার?" সাদা ফেট্টি বাঁধা ছুঁড়িটা এসে এক ঝাঁকি লাগায় সুফলের কাঁধ ধরে।

"থাকো থাকো ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ে ওঠো কেন? কাঁদতে হয় যাও বাইরে গিয়ে কাঁদো"—একটু থেমে, বলে—"কান্নাই বা কিসের

এত? তিনজন তো মরেছে? পুরো তিনহাজার পাবে। আমি অত টাকা পেলে বর্তে যেতুম, বুঝলে?"

—"দেশে ফিরে আরেকটা বিয়েসাদি করে ফেলিস"—সাদা ফেট্টি বাঁধা অন্য ছুঁড়িটা বলে। দুজনেই মুখ টিপে হাসে।

সুফল এদের কথার মানে বুঝতে পারে না। কী ভাষা বলছে এরা? এরা হাসছে কেমন করে? (ছামুতে ডাগর বউটো মইরেঁ্য পইড়েঁ্য আছেক, ইরা বুলে, গাঁকে যেইয়েঁ্য বিহাশাদি কর্? বুলে, তিনটো মইরেছোঁ্য তিনহাজার হবেক্? ইরা কি পাগল? ভূতপিরেত মানবেক্ লাই?)

দলের পাণ্ডা রবীন পোদ্দার, প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। সেও পার্টির দাদাবাবু। সব ছুটোছুটি থানাপুলিস সে-ই করছে। মাস্টার ছিল তাই রক্ষে। কতগুলো কাগজেই যে টিপসই করিয়ে নিলো এরই মধ্যে সুফলকে দিয়ে। সিদ্বু খুড়া সান্ত্বনা দিলে—

"টুকুস ভালো কথা, তুর মার জেবনের সুক্সাধটো মিটঁ্য যেইছোঁ্য। গঙ্গাচ্ছান কইরে মইরেছোঁ্য, সিধা স্বগ্গকে পোঁছাই যাবেক। হুঁ! হইছে বটেক অপমিত্যু, কিন্তুক পুণ্যচ্ছানের ফল লাই? উরা কুখুনো ভূতিন্-পেতিন্ হবেক লাই। এই বলোঁ্য দিলম্ তুখে।" এই বিধানটা খুব মনের মতন হয়েছে সুফলের। এইটুকুই ভরসা। গঙ্গাচ্ছানটা টাটকা টাটকা করা আছে, মা-বউয়ের স্বর্গে যেতে দেরি হবে না। (আর যেমুন ঘাঘী মরদটো সাথে যেইছেঁ্যা, বড়্কা মাঝি! বুড়াকত্তা পথকেই মরুক, উর্ ঠাণ্ডা মাথাটো হবেক লাই)।

বুড়াকত্তার পেট কাপড়ে পঞ্চাশটা টাকা বাঁধা ছিল। (আইব্বাপ্! বুড়াকত্তা, তুর্ প্যাটে ইথ টাকা?) মায়ের আঁচলেও ডবল গেরো দেওয়া দুটো টাকা ছিল। হাতে ছিল কাঁকন জোড়া। পুলিস সব খুলে এনে সুফলের হাতে তুলে দিয়েছে। কিছুই ছিল না কেবল লক্ষ্মীর ট্যাঁকে। গর্ভের সন্তানটুকু ছাড়া। তবে হাজার হোক নতুন বউ, নেই নেই করেও গা-ভর্তি গয়না তার। চকচকে কালো চামড়ার ওপর ঝকঝকে সাদা রুপো·বড্ড মানাতো বউটাকে। লক্ষ্মীর হাতের জোড়া-

বালা, গলার গোলাপ ফুলহার, কানের মাকড়ি, খোঁপার ফুল, পায়ের মল, মায় আঙুলের আঙট্ পর্যন্ত সব খুলে খুলে গুণে গুণে পুলিসরা যখন স্থফলের হাতে তুলে দিচ্ছে, স্থফল আরেকবার চীৎকার করে উঠল—"লক্ষ্মী রে! আই রে লক্ষ্মী! তুর্ জেবনের সক্সাধ ত কিছুই মিটলেক লাই? তুর্ প্যাটের ছেইল্যার মুখানটুস্ও দেইখ্যে যেইতোঁ লারলি তু—" রবীন মাস্টার ধমক দিলে,—"চুপ্ কর্। এখন ভাল করে গুছিয়ে রাখ দিকিনি গয়নাগাঁটিগুলো। খবদ্দার বেচবি না এক্ষুণি!"

না, বেচবে কেন স্থফল? এক্ষুনি তো হাতে বাহান্ন টাকা এসেছে স্থফলের, বাহান্নখানা তাসের মতন। আরও যা আসবে শুনেছে তাতে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে স্থফল মাঝির। নিজেকে পাপী-পাপী মতন লাগছে কেমন, কথাটা মনে পড়লেই। (কিন্তুক স্থফল মাঝির ইথে তুষটো কুথাকে? পাপটো কুথাকে মোর?) রবীন পোদ্দার খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছে (লিচ্চয় মিছা বুলেক লাই রবীন মাস্টার, সাঁচ্চা কথাই বুলছেক)! হিসেবপত্তর। বুড়ো ঠাকুর্দার জন্য এক হাজার, মায়ের জন্য এক হাজার, লক্ষ্মীর জন্য এক হাজার। মোট তিন তিন হাজার টাকার মালিক এখন স্থফল। খেসারতি দেবে তাকে সরকার। একসঙ্গে তিনশো টাকাই চোখে দ্যাখেনি যে-লোক সেই পাচ্ছে তিন হাজার। অত টাকা দিয়ে স্থফল করবেটা কী? তিনখানা জ্যান্ত মানুষ তো আর কিনতে পারবে না? তিন তো নয়, সাড়ে তিনখানা।

—"আর প্যাটের ছেইল্যাটো গেল ঝে? উটোর লেগে খেসারতি দিবেক লাই সরকার?"

—"বড্ড লোভ তো তোর?" ঘেন্নাঘেন্না স্থরে ধমকে উঠেছিল রবীন পোদ্দার—"যে ছেলে জন্মায়নি তার জন্যেও খেসারতি চাই?"

"চাই লয়? জন্মায় লাই সিটো কি তার তুষ্। তার মাথে মইরে দিছেঁ বইল্যেই লয়?"

"ক্কের তক্কো?" অবাক চোখে তাকিয়েছিল রবীন পোদ্দার।

"তোদের প্রাণে কি মায়ামমতা নেই রে? মা-বউ গেল, বুড়ো

ঠাকুদ্দা গেল, ঘর সংসার ফাঁকা ধুধু হয়ে গেল, আর তুই কষছিস টাকার হিসেব ? ধন্যি জাত মাইরি তোরা। সত্যি !"

সুফলের হিসেব কষার সেই আরম্ভ। বাহান্নর আটটা টাকা বেরিয়ে গেছে শ্মশানেই তিন তিনটে ঘরের জনের মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া কি সোজা কাজ ? প্রস্তুতি চাই না তার জন্য ?

—"যা যা বাড়ি চলে যা, এখেনে থেকে আর কাজ নেই তোদের। পঞ্চা, সিদুখুড়ো, সামলেসুমলে সুফলকে দেশে নিয়ে যাও দেখি তোমরা—পরের ট্রেনেই যাও।" ধমকে উঠেছিল রবীন পোদ্দার—"গুচ্ছের মদ গিলে শ্মশানেই মাতলামো শুরু করেছিস সুফল ? লজ্জাও করে না তোদের ? ছি ছি—"

—"সরকার খেসারতির ট্যাকাটো এখুন দিবেক লাই, মাস্টার ? ট্যাকা লিয়েঁ্য ঘরকে যেথম্ বেটে।"

—"ফের টাকার কথা ? বলিহারি যাই বাবা। সে টাকা পেতে পেতে এখন অনেক দিন ! হাতে হাতে পাবি নাকি ? দেবে ঠিক সময়মতন। সব খুইয়েও খেসারতির বেলা ঠিক হুঁশ্ টি দেখি টন্ টনে—"

\

তা হুঁশ টন্ টনেই বলতে হবে বই কি সুফল মাঝির। ট্রেনে চড়ে বসেই বিড়বিড় করে হিসেব কষতে শুরু করেছে।

—"তিনটো মনিষ মইরেছোঁ্য, তিন হাজার। একটো মনিষ মইরলেঁ এক হাজার। একটো মনিষ জন্মায় লাই, তাই উটোর কুন্থ খেসারতি লাই। সুদ্ধা যি-মনিষগুলান মিছা মিছা জন্ম লিয়েঁ্য মিছা মিছা মইরেঁ্য যেইছেঁক—" আঙুলের কড় গুণতে থাকে সুফল—"গোপলা মৈরেছে গেল সালকে রেলপুলিসের গুলি খেইয়্যাঁ, এক হাজার। লিতাই সিবার বানের জলকে ভেইসেঁ্য গেল, ভরপুয়াতি ছাগলীটো চালকে উঠাই লিজ্যে উঠতে লারলেক, অজয়ের ওঃ কী মরণ সোঁত—হা রে লিতাই ! এক হাজার। এক এক দুই। দাদী যেইছোঁ্য

কালেরা হইয়্যা, এক হাজার। তিন হাজার। বাপ-জেঠা গেল একই দিনকে জমিনের দাঙ্গাক লাঠি খেইয়্যা—বাপ চার। জেঠা পাঁচ। পাঁচ হাজার। পাঁচ তিন্‌কে আট। আর বুন দুটো তিনমাস পয়লা কয়লাখাদকে জলডুবি হইয়েঁ্য মইরেছেঁ্য—শালো কণ্টাক্টারের লালখাতাকে উদের নাম লিখায় লাই—সরকার বুন দুটার লেগে একডুন্ন ট্যাকাকড়ি দিলেক লাই—আট দুই দশ। আর প্যাটের ছেইল্যা মিনিমাঙ্‌না, উর্ বিলা খেসারতি লাই, সিটো জন্ম লিতেই লারলেক! ঠিক কাথা! কি বুল খুড়ো, আমি কি কম বুড়লুক? আইব্বাপ্। সিদা কাথা? দশ হাজার ট্যাকা পাইছিঁ বেটে, সরকার মোখে দশহাজার ট্যাকা দিছেঁ্যক—বাপ এক। জেঠা দুই। দাদী তিন। গোপ্‌লা চার। লিতাই পাঁচ। দুটো বুন, শালফুল, নিমফুল। পাঁচ দুই সাত। বুড়াকত্তা আট। মা লয়। লক্ষ্মী দশ। মোর ঘরকে কি কম লুক মেইরেছেঁ্য সরকার? খেসারতি দিবেক লাই? প্যাটের বিটাটো ফাউ। হুঁঃ—পুরো দশ হাজার। ট্যাকাটা হাথে পেইয়্যা দেইখোঁ্য খুড়া পরথম্‌কেই লক্ষ্মীকে সাঙ্গা কইরেঁ্য ঘরকে তুলব আমি, আর শালো দীনু চৌধুরীর হাথ মুচড়ায়্যা জমিন্‌টো কেইড়োঁ্য লিব। মোর বাপজেঠা জান দির্ছো উয়ার লেগে, কুনুদিনকে দীনু চৌধুরীর জমিন লয় সিটো—হুঁ,—" চোখটা জ্বলে ওঠে সুফলের। সেদিকে তাকিয়ে ভয় পায় সিদু।

—"হায় হায় গ" সিদুখুড়ো ফিস্‌ফিসিয়ে পঞ্চাকে বলে—"শোকে-দুখে ছেইল্যাটার মাথা বিগড়ায়্যা যেইছোঁ্য গ'—হাই ভগমান"—

—"কেনে? মাথা বিগড়াইছে বুল কেনে?" দাবড়ে ওঠে পঞ্চা। মদ সেও কম খায়নি।—"লেহ্য কাথাই বুলছেক বেটে সুফল। পরপর ঘরটো খালি হইয়েঁ্য যেছেঁ নি উর? খেসারতি দিবেক লাই কেনে সরকার? মরে লাই? জুয়ান জুয়ান মেইয়্যা মরদ মিছা মিছা মরে লাই উর ঘরকে? শালো কইলকাথাকে যেইয়েঁ্য মইরলে হাজার ট্যাকা আর গাঁওঘরকে মইরলে লবডংখ্যা?" সিদুখুড়ো ভয় পেয়ে

পাশের গাঁয়ের যাত্রীকে ডাকে—"আই মাঝি, ইরা বুলে কি? ছেইল্যাগুলান খেইপ্যে যেছেঁ নিকি?"

মেঝেয় থুথু ফেলে মুখ ভেংচে মাঝবয়সী লোকটি বলে—"তুমিও কি খেইপলে নিকি মাঝি? মদ খেইয়্যাঁ কী বুলতে কী বুলছেক, ধুস্, উসব শুন কেনে?"

॥ চোখ ॥

বীরুবাবু সকালবেলায় দোতলার বারান্দায় দাঁতন করছিলেন, এমন সময়ে সেই বিরক্তিকর হরিধ্বনি। কেওড়াতলার কাছাকাছি বাড়ি নেবার ফলটা এই হয়েছে যে একটা দিন যায় না মড়া না দেখে। ইচ্ছে না করলেও চোখ পড়লো নিচের দিকে, কেমন যেন চমকে উঠলেন। মৃতদেহের তো চোখ সাধারণত বোজা থাকে, না-বুজলে তুলসীপাতা চাপা দেওয়া থাকে। এই মুখটা—ঠিক যেন কোনো জীবন্ত লোক খাটিয়ায় শুয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। রোগাটে ছুঁচলো মুখ, ফর্সাই বলা যায়, সরু কালো গোঁফ ঠোঁটের ওপরে। ওপরের ঠোঁটটা অদ্ভুত-ভাবে একটু কাটা—ফাঁক দিয়ে একটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তার চোখদুটি মেলা। একটা চোখ আরেকটার চেয়ে বড়, যেন ওপরের পাতাটা নেই—পাথরের চোখের মত—পুরো মণিটাই প্রায় দেখা যাচ্ছে। বীরুবাবুর বেজায় অস্বস্তি হলো। ব্যাটারা আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে লাল আলোর জন্যে—বীরুবাবুর মোটে ইচ্ছে না করলেও, নড়তে পারলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন বারান্দায় সেঁটে, ওই জ্যান্তমতন মরা মুখখানার দিকে চেয়ে। দেখতে-দেখতে কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হলো মুখটা ?

নিশ্চয় দেখেছেন। কোথায় ?······কোথায় ? বাজারে কি ? মাছওলা কোনো ? সব্জীওলা। ট্রামে কি ? কণ্ডাক্টর ? কোথায় ? শ্যালদা লাইনে ট্রেনের ফেরিওলা নয় তো ? নাঃ—এসব অদ্ভুত সংস্রব মনেই বা আসছে কেন তাঁর ? মুখখানা খুব চেনা-চেনা লাগছে—অথচ কিছুতেই ঠাহর করতে পারছেন না কী জন্য চেনা। ভাবতে ভাবতেই আলো বদলালো, হরিধ্বনি দিয়ে ওরা চলে গেল। খাটিয়ায় শুয়ে ওঁরই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুলতে দুলতে চলে গেল লোকটা। চেরা-ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতটা যেন হাসছে।

বিশ্রী লাগছে সক্কালবেলাতে এই বিতিকিচ্ছিরি মড়ার মুখ দেখা।

বীরুবাবু কলঘরে গেলেন মুখ ধুতে। চোখে বারবার জল ছড়া দিয়ে যেন ওই বিস্বাদ অভিজ্ঞতাটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেন। মড়ার মুখে কত প্রশান্তি থাকে। মড়ার মখে এমন ফিচেল-ভাব তিনি জীবনে দেখেননি। চা-খবরের কাগজের ফাঁকে ফাঁকেও বিতৃষ্ণার অনুভূতিটা যেন ফিরে আসতে লাগলো। তিনি থলি হাতে বাজারে বেরুলেন।

চেনা মাছওলা, চেনা আলুওলা, চেনা ফলওলা। বাজারে তাঁর সবাই চেনা। তবুও বীরুবাবু আজ প্রত্যেকের দিকে নতুন চোখে চাইতে লাগলেন—যেন কোথাও কিছু লুকিয়ে আছে। বীরুবাবু দুশো পার্শে বেছে নিলেন, পাঁচশো আলু, দেড়শো পেঁয়াজ একশো ঢেঁড়স, চারটে মুলো, শাক তিন আঁটি—হঠাৎ দেখতে পেলেন। শাকউলি বুড়ির বাঁ চোখটার মণিতে যেন ঢাকনি নেই—ছুঁচলো মতন মুখখানা।—বীরুবাবুর হাত থেকে শাক পড়ে যাচ্ছিলো, বুড়ি তাড়াতাড়ি তুলে দিল, আধুলি থেকে কুড়ি পয়সা ফিরিয়ে দিলে—অন্যদিকে চেয়ে অন্ধের মত কোনোমতে পয়সাটা নিয়েই বীরুবাবু চলে এলেন।

শসা এক জোড়া,—মাথা ঠাণ্ডা করে বীরুবাবু ভাবলেন, আজ বেসপতিবার, ছ'টা কলা, দুটো কমলালেবু নিতে হবে। গিন্নির লক্ষ্মী-পুজোর বাই আছে। সংসারে তো লক্ষ্মী উথলে উঠছে। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তবু লক্ষ্মীপুজোর ফলটি চাই। বাতাসা চাই। বীরুবাবুর ভুরুটা কুঁচকে উঠলো। তিনি এসব পুজো-ফুজো-তে বিশ্বাস করেন না। তবু গিন্নিকে নিজের মনে থাকতে দেন। ছেলেপুলে হয়নি,—কিছু একটা নিয়ে থাকবে তো মানুষ। তাঁর না-হয় অফিস আছে। সন্ধ্যেবেলা নগেনবাবুর বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা আছে। গিন্নি বেচারীর ওই সিনেমার কাগজ, কখনো একটা বাংলা ছবি, আর লক্ষ্মী-পুজো, সত্যনারায়ণ—এই নিয়েই তো জীবন। ভাবতে ভাবতে গিন্নির প্রতি করুণায় মনটা আবার নরম হয়ে এলো বীরুবাবুর। আহা করুক একটু—শখ আহ্লাদ বলতে তো ওইটুকু। কলা কত করে?—লোকটা পিছন ফিরে টাঙাচ্ছিলো কলার কাঁদি—বললো—কোন কলাটা?—বলতে বলতে এপাশ ফিরলো। রোগাটে, ছুঁচলো মুখ, ওপরের

ঠোঁটটা চেরা, ফাঁক দিয়ে একটা হলদে দাঁত বেরিয়ে আছে—সরু গোঁফে ঢাকা পড়েনি। বীরুবাবুর গলার ভেতরে নিঃশ্বাস আটকে এলো—তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। গিন্নি, বেসপতিবার, ফল, বাতাসা···ছিট্‌কে সরে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। কলাওলা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। বীরুবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মনের লাগামটা কষে ধরতে।

বাজারের জনস্রোতে কারুর দিকে চাইতেই ওঁর কেমন ভয় করতে লাগলো, যেন প্রত্যেকের মধ্যেই একটা চমক্ থাকতে পারে। কোনো-দিকে-না-তাকিয়ে হাঁটতে গিয়ে কার বুঝি পা মাড়িয়ে দিলেন—উঃ, দেখে চলতে পারেন না? পায়ে কি খুর বাঁধিয়ে রেখেছেন দাদা?—বীরুবাবুর যেন জ্ঞান ফিরলো—আহা, লাগলো? বলতে বলতে তিনি পাশে চেয়ে দেখলেন 'লোকটি নিচু হয়ে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মুখ তুলে তাকালো—বাঁ চোখ ভাবলেশহীন, বিস্ফারিত, ডান চোখে রাজ্যের বিরক্তি, সরু গোঁফের নিচে চেরা-ঠোঁটের ফাঁকে হলদে দাঁত যন্ত্রণায় খিঁচিয়ে রয়েছে—প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বীরুবাবু দ্রুত সরে গেলেন। বাজার করা মাথায় উঠলো, বাড়ি পেঁছুতে পারলে বাঁচেন। কেমন যেন দুর্বল লাগছে পা দুটো, মাথার ভিতরটায় গুম্‌গুম্ আওয়াজ হচ্ছে, ব্রীজের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি গেলে যেমন হয়, নিজের পায়ের ওপর যেন নিজের কন্ট্রোল নেই, বীরুবাবু ডাকলেন: এই রিকশা। রিকশওলা পাদানিতে বসে ঝিমুচ্ছিলো, ডাক শুনে জেগে উঠলো। বিস্ফারিত বাম চোখে দৃষ্টি নেই—চেরা ঠোঁটের ফাঁকে—বীরুবাবু আর তাকাতে পারলেন না, আপনি বুজে গেলো চোখ—ছুটে গিয়ে পাশের ট্যাক্সিটার দরজা খুলে উঠে পড়লেন। আঃ! সীটে গা এলিয়ে দিয়ে কী আরাম।

সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত কাঁপুনি হচ্ছে যেন—এই মুহূর্তে এই বসবার জায়গাটা না পেলে উনি নিশ্চয় রাস্তায় পড়ে যেতেন। মোটা আওয়াজে সর্দারজী জিজ্ঞেস করলো, কিধর যানা? বীরুবাবু ক্লান্ত গলায় নির্দেশ দিলেন। এতোই কাছে যে ড্রাইভার বিস্মিত হল।

বাড়িতে এসে নেমে তিনি ড্রাইভারকে এক টাকা ষাট দিতে গেলেন খুচরোই সমস্তটা। ড্রাইভার চোখ থেকে রোদের চশমাটা খুলে পয়সা গুনতে লাগলো। গুনে নিয়ে বীরুবাবুর দিকে চেয়ে বললে, বাস! ঠিক হ্যায়। বীরুবাবু দেখলেন সর্দারজীর দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে বাঘের মত নিষ্পলক বাঁ চোখ—যেন পাথরের চোখ চামড়া ঢাকা নেই। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সিঁড়ির তলার পরিচিত স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকারে পৌঁছে তাঁর যেন বুকটা ফেটে যেতে চাইলো। হাঁটুতে হাঁটু জড়িয়ে যাচ্ছে দেখে প্রথম ধাপটাতে বসে পড়লেন। বাইরে আওয়াজ পেলেন, স্টার্ট দিয়ে ট্যাক্সি চলে গেলো। বীরুবাবুর যেন ধড়ে প্রাণ ফিরলো—সঙ্গে সঙ্গে চোখ-ছুটোও যেন ভিজে ভিজে হয়ে এলো, সেই বুক-ফাটা চাপটা যেন চোখ থেকে বেরুবার পথ পাচ্ছে। রুমাল বার করে চোখমুখ মুছলেন বীরুবাবু। এবারে ওপরে গিয়ে ভালো করে এক কাপ চা খেতে হবে। কী আশ্চর্য বিভ্রম!

বিভ্রম ছাড়া এটা কিছুই নয়। বীরুবাবু ভাবলেন, সকালে উঠেই প্রায় আধা ঘুমের মধ্যে অমন বীভৎস মড়া দেখবার যা একখানা অভিজ্ঞতা চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—হয়েছে আরকি যত সব অবচেতনের বজ্জাতি। যাকে বলে হ্যালুসিনেশন! এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যান্ত কালী দেখতেন, শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে দেখলেন জগন্নাথ মূর্তি—আর বীরুবাবু চতুর্দিকে মড়া দেখছেন। তাঁরা ছিলেন গিয়ে পুণ্যবান ব্যক্তি—আর সরকারী কেরানীর কপালে জ্যান্ত নরক ছাড়া কিইবা জুটবে! বীরুবাবু ভাবলেন, খাওয়া-দাওয়াটায় একটু যত্ন নিতে হবে এবার। বেশি করে প্রোটিন ও ভিটামিন খাওয়া উচিত। ছুধ তো বহুদিন বন্ধ। মাংস-ডিমও বন্ধ। হবে না? পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীরে রাসায়নিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তাই থেকেই এসব স্নায়বিক রোগের উৎপত্তি। নার্ভাস ডিসঅর্ডার ছাড়া কিছু নয়। গোড়াতেই এর উচ্ছেদ দরকার। উনি আজই ডাক্তারের কাছে যাবেন। ভিটামিন বড়ি-টড়ি একটা কিছু খেতে হবে আরকি। বয়েস

হচ্ছে শরীরের বল, রস ফুরিয়ে আসছে। এখন বাইরে থেকে বলসঞ্চার করা দরকার। ফুড সাবস্টিট্যূশন দরকার ওষুধ দিয়ে। ভাবতে ভাবতেই বীরুবাবুর পায়ে বল এলো। তিনি সহজভাবে উঠে দাঁড়ালেন। থলি হাতে উপরতলায় উঠে গিয়ে কড়া নাড়লেন সিঁড়ির মাথায় থেমে।

গিন্নি এসে দোর খুলে দিলেন—কিগো, আজ এত দেরি? আমার তো ভাবনাই হয়ে গিয়েছিলো। যা দিনকাল!—বীরুবাবুর হাত থেকে থলিটা নিতে হাত বাড়ালেন গিন্নি।

—আর বোলো না! আজ এমন একটা অদ্ভুত—বলতে বলতে বীরুবাবু একমুহূর্ত থামলেন—ওকে এটা হঠাৎ বলা কি ঠিক হবে? এসব ব্যাপার মনের ভেতরে ঢুকিয়ে না দেওয়াই ভালো—এমনিতেই যা ভীতু মানুষ—এসব আন-ক্যানি গল্প ওকে বলে কাজ নেই। অটো-সাজেশন বলেও একটা জিনিস আছে। বীরুবাবু কথা ঘুরোনো ঠিক করে নিয়ে থলিটা গিন্নির হাতে তুলে দিলেন। দিতে দিতে দেখলেন গিন্নির বাঁ চোখের মণিটায় অকূল বিস্ফারিত দৃষ্টিহীনতা, চেরা ওপরের ঠোঁটের ফোকরে একটি হলদে দাঁত তাঁরই দিকে হাসছে। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো, সহসা পিছন দিকে হেলে পড়লেন। গিন্নির আর্তনাদের মধ্যে বীরুবাবুর দেহ সিঁড়ির ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়তে লাগলো নিচে। আরো নিচে।

[উপসংহার: ডাক্তার এসে বলেছিলেন, স্ট্রোক। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু। কতশত স্ট্রোকের পিছনে যে কি গল্প থাকে, আমরা কি জানতে পারি? বীরুবাবুর গল্পটাই তো তিনি বলে যেতে পারলেন না]।

॥ স্যুটকেস ॥

চন্দন বাবার জন্যে বিলেত থেকে ঘড়ি আনলো, কিন্তু মার জন্যে কী যে আনবে ভেবে পেলো না। শেষে কী ভেবে একটা লাল-টুকটুকে, ছোটো দেখে হালকা ফাইবার গ্লাসের স্যুটকেস কিনলো। বাবা ঘড়ি পেয়ে মহাখুশি, এক স্নানের সময়েই যা ঘড়িটা খুলে রাখতে বাধ্য হন।



আর মা গদ্‌গদচিত্তে স্যুটকেসটিকে একটা টুলের ওপরে, ফুল-তোলা কাপড় দিয়ে ঢেকে, সাজিয়ে রাখলেন।

চন্দনের ছোটো ভাই বুচকুন এখনও কলেজে পড়ে, মা-বাবার কাছে শুধু সেই থাকে। আর থাকে সেজ বোন ইন্দিরা, ওখানে গার্লস স্কুলে পড়াচ্ছে। ছোটো বোনটা ক্লাসফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে আগেই কলকাতায় চলে গেছে। দিদি মেজদি তো বহুকাল শ্বশুরবাড়িতে। দিদির ছেলেই বুচকুনের সমান। চন্দনের চার দাদাও বিয়ে-থা করে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। দশ ছেলেমেয়ের মা হলে কি হবে সলাজনয়নী এখনো বেশ শক্ত আছেন, রান্নাবান্না নিজেই করেন। ক্ষেত্রবাবুর এই আটাত্তর হোলো বাঁ-চোখে ছানি পড়েছে, ভাল দেখতে পাচ্ছেন না আজকাল। চন্দন তাই চিঠিতে দরকারি অংশগুলো আনডার লাইন করে দেয়।

আপাতত চন্দনের দুটো চাকরি হয়েছে বার্নপুরে। এক ইঞ্জিনীয়ারিং, আরেক বোনের জন্যে ঘটকালি। বাবা-মায়ের মনে এখন প্রধান উদ্বেগ ইন্দিরা, যার বয়েস সাতাশ পুরেছে। গোটা শিলিগুড়ি শহরে নাকি সাতাশ বছরের অবিবাহিত কন্যা আর একটিও নেই। চিঠিতে চন্দন তাই নিয়ম করে পাত্রের খবর পাঠায়। সাধারণত খাঁটিই, মাঝে মাঝে অবশ্য কল্পিতও। কেননা চন্দন সার কথাটা বুঝে গেছে, বাবা-মাকে সবচেয়ে খুশি করতে পারে এই একটিই প্রসঙ্গ।

সেদিন চন্দনের চিঠিতে একটা চমৎকার সম্বন্ধ এলো—পাত্র এই শিলিগুড়িরই ছেলে, কাজ করে আসানসোলে, মাইনিং এঞ্জিনীয়ার। বাবা যদি সম্বন্ধটা পছন্দ করেন, তবে চন্দন কথা বলতে পারে ছেলের সঙ্গে। বাবা যাতে যোগাযোগ করতে পারেন পাত্রের বাবার সঙ্গে তাই শিলিগুড়ির ঠিকানাটাও পাঠিয়েছে চন্দন। ছানি-পড়া চোখে বাবা অধিকাংশ সময়েই আন্দাজে কাজ সারেন। তিনি আন্দাজে পড়লেন যে, চন্দন কথা বলে ফেলেছে পাত্রের সঙ্গে, এখন বাবা যেন কথাটা পাকা করেন পাত্রের বাবার সঙ্গে। বাবা ছাতাটা নিয়ে জুতোতে পা গলাতে গলাতে ডাকলেন,—"বড়বৌ, আমি একটু

বেরুচ্চি। কথাটা পাকা করে আসি, ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা যখন হয়েই গেছে। কাল বিকেলেই ওরা মেয়ে দেখে যাক।"

মা (ওরফে বড়বৌ) বললেন—"সে কিগো ? পাকা কথা কি ? চন্দন তো কোনো কথাই পাড়েনি এখনো। তুমি বরং যাও, পাওনা-থোওনা কে কিরকম চায় সব শুনে এসো, ঘরদোর দেখে এসো, মেয়ে দেখানো এক্ষুনি কী ? ও পরে হবে। কালই দেখাতে হবে না।"

বাবার কেবল চোখেই ছানি নয়, কানেও একটু কম শোনেন মাঝে মাঝে। তাই রাগটা ইদানীং বেড়েছে। বাবা রেগে বললেন—"মেয়ে দেখানো হবে না ? বেশ আমি তাহলে চন্দনকে লিখে দিচ্ছি এ সম্বন্ধ ক্যানসেল, এখানে হবে না।"

—"আহা, আমি কি তাই বলেছি ? আগে তুমি অন্য অন্য কথা-বার্তা কয়ে নাও, ঘরটা কেমন বুঝেশুনে এসো. চন্দন ওখানে পাত্রের সঙ্গে কথা বলুক, তারপরে তো মেয়ে দেখাবে ?"

কেবল আধখানা শুনতে পেয়ে বাবা বললেন—

—"ও ! চন্দন পাত্রের সঙ্গে কথা বলবে, তারপরে হবে। আমি কেউ নই ? আমার কথা বলা চলবে না ? বেশ, দেখাচ্ছি কেমন আমি কেউ নই। এই চললুম পাত্রপক্ষকে বারণ করে আসতে। দেখি এ বিয়ে কী করে হয় ? বিলেত ফেরত বলেই ছেলের কথা বাপের কথার ওপরে উঠবে ?"

বাবা জুতো পরে ছাতা বগলে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে মাও চেঁচিয়ে উঠলেন—

—"এঁ্যা, বিয়ে ভাঙতে গেলেন ? এতবড়ো রাগ ? বাপ হয়ে মেয়ের এতবড়ো সব্বোনাশ করা ? বেশ। আমিও চললুম তবে মাথাভাঙ্গা !"

চন্দনের মামাবাড়ি মাথাভাঙ্গার কাছাকাছি। রাগ করে কথায় কথায় গত পঞ্চাশ বছর ধরেই সলাজনয়নী বলে আসছেন—"এই চললুম আমি মাথাভাঙ্গা।" কিন্তু তারপরে কার্যটি আর এগোয়নি।

এগোয়নি, তার কারণ একাধিক। প্রথম কথা, শিলিগুড়ি থেকে

মাথাভাঙ্গার কাছে ওই পাড়াগাঁয়ে যাওয়াই ছিলো এক বিপুল জটিলতা। যেতে হলে জলপাইগুড়ি হয়ে ট্রেন বদলে, অন্য ট্রেন ধরে তারপরে বাস ধরে, তারও পরে হাতি কিংবা ডুলি চড়ে, যেতে হতো। যদিও বা কোনো জাদুবলে মা একা একা এতকাণ্ড করতেনও, মস্ত একটা দ্বিতীয় বাধা ছিলো, তোরঙ্গ। চন্দনের বাড়িতে কেবল ধেড়ে ধেড়ে স্টীলের ট্রাংক আর কাঠের প্যাটরা ছাড়া বাক্সোই ছিলো না। সুটকেসের চল হয়নি চন্দনের বাড়িতে। তা, রাগ করে কি কেউ একখানা ধুমসো ভারি তোরঙ্গ মাথায় করে বাপের বাড়ি যায়? নাকি এক কাপড়ে ভিকিরির মতনই কেউ খালি হাতে বাপের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে? এই গূঢ় সমস্যার কারণেই মা এতদিন "চললুম মাথাভাঙ্গা"টাকে কাজে পরিণত করতে পারেননি। পঞ্চাশ বছর পরে, এতদিনে সমস্যার সমাধান হয়েছে। মা ফুরফুরে হালকা বিলিতি সুটকেসে ভরে নিলেন ক'খানা ভালো দেখে ধোপ-দোরস্ত শাড়ি-সেমিজ, গুরুদেবের ফটো, জপের মালা, তেল সাবান গামছা, ফিতে চিরুনী আয়না আর জমানো হাতখরচের টাকাটা। ছোকরা চাকর পরমেশ্বরের হাতে এক টাকা চারানা দিয়ে বললেন—"একটা সিনেমা দেখে আয়।" দোরে তালা লাগিয়ে দোরের চাবি, ঘরের চাবি প্রাতিবেশিনীর আঁচলে বেঁধে দিয়ে এলেন—'ইন্দু ইসকুল থেকে এলেই তাকে দিয়ে দিয়ো—' বলে। বুচকুন তখনও কলেজে।

সোজা একটি রিকশা চড়ে মা গেলেন সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে। গত পুজোয় তাঁর দাদার ছেলেরা এসেছিলো—আজকাল দিব্যি টানা বাস হয়ে গেছে শিলিগুড়ি টু মাথাভাঙ্গা। চমৎকার নতুন টারম্যাকের রাস্তা হয়েছে। বদল-টদল করতে হয় না কোথাও। ওখানে নেমেও হাতি চড়তে, কি ডুলি নিতে হয় না। রিকশা করেই বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বাড়ি যাওয়া যায়। দাদার ছেলেরা বার বার করে ডিরেকশান দিয়ে গেছে—মা তো প্রায় চোখ বুজেই পৌঁছে গেলেন দাদার বাড়ির দোর গোড়ায়। দাদা বুড়ো হয়েছেন, বৌদিও। কিন্তু স্বয়ং সলাজনয়নী দেবীকে দোরগোড়ায় একাকিনী সশরীরে সুটকেস হস্তে মজুত দেখে

তাঁরা যেন আহ্লাদের চোটে খোকাখুকু হয়ে পড়লেন। ভাইপো-ভাইঝি, নাতি-নাতনীদের মধ্যে উল্লাসের সাড়া পড়ে গেলো—এ যে রিয়্যাল অ্যাডভেঞ্চার।

এদিকে বুচকুন, ইন্দিরা আর তাদের বাবার চক্ষে ঘুম নেই, অন্নে রুচি নেই। রান্নাবান্না করে ইসকুল করতে ইন্দুর বেশ স্ট্রেন হচ্ছে, বাবা এদিকে পরমেশ্বরের রান্না মোটেই খাবেন না। চিঠির পরে চিঠি যাচ্ছে মাথাভাঙ্গা, জবাব আসে না। শেষে মামাবাবুই লিখলেন—'নয়ন এখন কিছুদিন এখানে থাকিবেক। উহার দেহ আগে আরও একটু সারিয়া উঠুক!'—

শুনে বাবা আর থাকতে পারলেন না, সেইদিনই বুচকুনকে মাথা-ভাঙ্গায় পাঠালেন। পরের বাসেই। বুচকুন গিয়ে দ্যাখে মার শরীর দিব্যি ভালোই আছে। বুচকুনকে দেখে মা লজ্জা-লজ্জা হেসে বললেন—'এসেছিস? চল, যাই। এই দ্যাখ না এরা কি যেতে দেয়?'—বুচকুনকেই কি ছেড়ে দিলেন তাঁরা? মামামামী? কি ভাইবোনেরা? অতএব বুচকুনও রইলো।

এবারে ইন্দিরার চিঠি এলো—'মা, আমি আর পারছি না, বাবার মেজাজ ভীষণ খারাপ, দিনরাত্তির রাগারাগি করছেন। পরমেশ্বরকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার বড়ই খাটনি পড়েছে। তোমরা কি ওখানেই থাকবে?'

বাবাই দোর খুললেন। মা লাজুক লাজুক মুখে অল্প হেসে প্রণাম করে বললেন—'সব ভালো তো?' বাবা জবাব দিলেন না। মা বললেন—'ইন্দু কোথায়?' যদিও জানেন ইন্দু তখন ইসকুলে। বাবা জবাব দিলেন না। মা ডাকলেন—'পরমেশ্ব-র!' এবার বাবা কথা বললেন—'নেই।' মা এটাও জানতেন।—'কবে গেল?'—অনেকদিন। এবারে আমিও যাবো।—তুমি কোথায় যাবে?—তা দিয়ে তোমার দরকার কি? তবে মাথাভাঙ্গাতে নিশ্চয় যাবো না। মাথাভাঙ্গার পবিত্র নাম এমন অশ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হতে দেখে মার তক্ষুনি মেজাজ

থাপ্পা হয়ে গেলো। শক্ত গলায় মা বললেন—যেখানেই যাও, আমার স্যুটকেসটা নিয়ে যাওয়া হবে না। বাবা রহস্যময় হেসে উদাস সুরে বললেন—আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে স্যুটকেস লাগে না। এই কথাটিতে মা কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন বলে মনে হোলো। ভীতু-ভীতু অপ্রস্তুত চোখে বাবার কাছে ঘেঁষটে এলেন—কোথায় যাবে গা? বলো না? বাবা সুরুৎ করে কিছুটা সরে গিয়ে মার নাগাল বাঁচিয়ে বললেন—রাস্তার কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে এলে হতো না, সব ছোঁয়া-ন্যাপা করবার আগে? মা কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি কলঘরে চললেন।

রাত্রে খেতে বসে বাবা বললেন,—কাল সকাল সকাল পুজোটুজো সেরে তৈরি হয়ে নেবে। আমার সঙ্গে কোর্টে যেতে হবে। মার হাতের রুটিটা হাতেই রইলো, তাওয়ায় আর পড়লো না।

—'কোর্টে? আমি? আমি কেন কোর্টে যাবো? আমি বাপু সাক্ষী-টাক্ষী হতে পারবো না তোমাদের খুড়ো-ভাইপোর ব্যাপারে।'

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাবার কী একটা মামলা চলছিল বহুদিন। জ্যাঠামশাই মারা গেছেন, ছেলের সঙ্গে চলছে। বাবা বললেন—'সে মামলা নয়। এ অন্য মামলা। ডিভোর্সের মামলা। তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে আর আমি তাই সইবো ভেবেছো? আমি কালই তোমাকে ডিভোর্স করবো। অম্লান বদনে মা বললেন—তা করো না। তার জন্যে কোর্টে কেন যেতে হবে? ডিভোর্সটা তো বাড়িতেই হতে পারে।—

—তোমাকে এই সুখবরটি কে দিলেন শুনি? জানো, ডিভোর্স মানে কি?

—খুব জানি। ওই সই করে সাক্ষী ডেকে বিয়ে ভাঙা তো? তা এ বাড়িতে কেন হবে না?

—বাড়িতে এইজন্যে হবে না যে এটা আইনগত ব্যাপার।

—কেন? আইনের বিয়ে তো বাড়িতেই হয়। সে বুঝি দেখিনি? বন্দনাকে দিব্যি পুরুতমশাই বাড়ি বয়ে এসে সই করিয়ে বিয়ে দিয়ে

গেলেন। এ ডিভোর্সের পুরুতমশাই ইচ্ছে করলেই বাড়িতে এসে—বাবা কাতরে ওঠেন—ডিভোর্সের পুরুত! আর পুরুত নয়, পুরুত নয়, সে লোকটা ছিলো গিয়ে রেজিস্ট্রার। কিন্তু ডিভোর্স তো রেজিস্ট্রারে করতে পারে না, ওটা উকিলের কাজ।

—অ! তা না হয় হলো, উকিল বুঝি আর বাড়িতে আসে না? আসুক সে-উকিল বাড়িতে।

—'না না, ও হয় না। কোর্টে যেতে হয়। জজের সামনে সওয়াল করতে হবে না?'

—সওয়াল করার কি আছে। একি চোর দায়ে ধরা পড়েছে কেউ? যতো বাজে কথা। বাড়িতেই হোক ডিভোর্স।

—'দ্যাখো বড়বৌ—বাজে বকবক কোর না তো মেলা! বলছি ওসব বাড়িতে হয় না।'—মা এবার একটু আদুরে গলায় বললেন—

—'হ্যাগা, তা বাড়িতে যখন হবেই না, তবে কোর্ট-কাছারিতে কেন, তার চে' বরং কালীবাড়ি গিয়ে ডিভোর্স করলে হয় না? ছোটো খুকিরা তো কলকাতায় গিয়ে কালীবাড়িতেই নিজেরা বিয়ে করে নিয়েছে, অমনি কালীবাড়ির ডিভোর্সও নিশ্চয় হয় আজকাল? সে বরং ভালো।'

—'ও হোঃ! এই গোমুখ্যুকে নিয়ে আমি কী করি, কোথায় যাই। বলি বিয়ে আর ডিভোর্স দুটো জিনিস কি এক হলো?'

—'হোলো না? গেরো বাঁধা আর গেরো খোলা। একটা হয়েছে ভগবান সাক্ষী রেখে, অন্যটার বেলায় বুঝি শুধু হাকিম-মুৎসুদ্দি হলেই চলবে? ভগবান চাই না? অমনি বললেই হোলো?'

—'হা ভগবান। আমি আর কোনো কথা শুনতে চাইনে, কোর্টে কাল তোমায় যেতেই হবে বড়বৌ। সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিয়ো, পুজো সারতে তিন ঘণ্টা লাগিয়ে দিয়ো না। ফার্স্ট আওয়ারেই পৌঁছুতে চাই।'

—কোর্ট-মোটে যেতে আমার বয়েই গেছে। কেন মরতে কোর্টে যাবো? আমি এই পস্টাপস্টি বলে দিলুম, দ্যাখো উকিল যদি ঘরে

আনতে পারো তো আমি ভালোয় ভালোয় ডিভোর্স হবো, নইলে তুমি যতো ইচ্ছে কোর্টে গিয়ে একা-একাই ডিভোর্স হওগে যাও। হুঁ!'

এবারে বাবা রীতিমতো হুংকার দিয়ে ওঠেন—'বাঃ! একা-একা ডিভোর্স হওগে যাও! বলি—একা-একা কি বিয়েটা হয়েছিল, যে একা-একা ডিভোর্স হবে?'

—'কেন তুমি তো বললে এটা বিয়ের মতন নয়, অন্য ব্যাপার। আবার এখন কেন বলছো বিয়ের মতন?'

বাবা এবার আহতকণ্ঠে খেদোক্তি করলেন—'আহ্ মেয়েমানুষদের মুখ্যু কি আর সাধে বলেছে? নির্বোধ? বোধ-বুদ্ধি কিস্যু নেই?' আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে মেঝের ওপর ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'বেশ বেশ! মুখ্যু তো মুখ্যু! তা মুখ্যুকে নিয়ে ঘর করতেই বা কে বলেছে, ডিভোর্স করতেই বা কে বলেছে? আমি বলেছি? আমি এই চললুম মাথাভাঙ্গা। ব্যস। ইন্দু আমার স্যুটকেসটা দে তো মা।'

ঠিক এই সময়ে পড়ার ঘর থেকে বুচকুন চেঁচিয়ে উঠলো—'ব্যাপারটা এখন মুলতুবি থাকুক মা—এসব নতুন আইন তোমরা কেউই ঠিকমতন জানো না—আমার পরীক্ষাটা এ-মাসে হয়ে যাক, তারপর আমিই সব খোঁজখবর এনে দেবো তোমাদের। কিচ্ছু ভাববেন না বাবা, আমিই সব বন্দোবস্ত করে দেবো। মেজজামাইবাবুর কাছে সব আইনকানুনগুলো জেনে এলেই হবে কলকাতা থেকে। আপনারা কেবল বলে দেবেন সেজদি কোন পক্ষে সাক্ষী দেবে, আর আমি কোন পক্ষে। পরমেশ্বরটাকেও ডেকে আনা দরকার। কে জানে সে ব্যাটা কোন পক্ষে যাবে?'

—হুঁ যত্তো সব ইয়ে ছেলে হয়েছে আজকাল। সব কথায় কথা কওয়া চাই। সভ্যতা ভব্যতা কিছুই শেখাওনি তো ছেলেদের—যেমন মা, তেমনি ছেলে—বলতে বলতে বাবা উঠে পড়লেন, চটি ফটফটিয়ে কলে গেলেন আঁচাতে। মা বললেন—'ঠিক আছে, এখনকার মতন থাকলাম। বুচকুনের পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক। কিন্তু এই বলে

রাখছি, পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিনই আমি মাথাভাঙ্গায় চলে যাবো। স্যুটকেস আমার গোছানোই রয়েছে। হুঁঃ।'

বিলেত থেকে ফেরার পরে তিন মাসের মাথায় চন্দনের কাছে বাবার এই চিঠিটি এলো—

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু,

বাবা চন্দন, তোমার মাকে বিলাইতী স্যুটকেস উপহার দিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমার খরচ ও অসুবিধা দুইটাই যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি করাইয়াছ। আরেক ঝামেলা করিয়াছে এই বাসরুট হইয়া। লাভের মধ্যে তোমার মা মাসের মধ্যে তিনবার স্যুটকেস গুছাইয়া বাসে চড়িয়া মাথাভাঙ্গায় গোসা করিতে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্রীমান বুচকুনকেও কলেজ কামাই করিয়া হপ্তায় হপ্তায় মাথাভাঙ্গায় ছুটিতে হইতেছে। খরচের কথা বাদই দাও, ইহাতে বুচকুনের পড়াশুনার যারপরনাই ক্ষতি হইতেছে। তাল বুঝিয়া পরমেশ্বর হতভাগা বাজারে দোহাত্তা চুরি করিতেছে। ইন্দুমায়ের স্কন্ধে রান্নাবান্না সংসারের পাট এবং চাকুরি, সমস্তই আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ইন্দুর স্বাস্থ্য বেশ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এভাবে চলিলে আর কেই বা উহাকে বিবাহ করিবে? আমাদিগের নাওয়া-খাওয়া সকলই মাথায় উঠিয়াছে, প্রাণে স্বস্তি নাই। বাড়িতে অশান্তির সীমা নাই। চূড়ান্ত অনিয়ম সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ অলক্ষুণে স্যুটকেস আমদানি করিয়া সংসারে ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছ। আমার সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, 'দুর্গাপূজার সময়ে আসিয়া তুমি অই বাহারী বিলাইতী স্যুটকেস অতি অবশ্যই ফিরাইয়া লইয়া যাইবা। ইহার কোনমতেই নড়চড় না হয়। (এই দু'লাইন লাল পেন্সিলে আনডারলাইন করা।)

আশা করি কর্মস্থলের এবং অন্যান্য সমস্তই কুশল। শ্রীভগবানের নিকটে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি ৯ই আশ্বিন, ১৩৮১

আঃ শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ চক্রবর্তী।

পুনশ্চ: সুবিধা থাকিলে বরং তোমার মায়ের জন্য একটি ছোট দেখিয়া লোহার আলমারি কিনিয়া দিয়া যাইও।

॥ জগমোহনবাবুর জগৎ ॥

কলকাতা এসেছি দিন কয়েকের জন্যে। কাকার কাছেই উঠব। কাকা বছর কয়েক হলো বাড়ি করেছেন নিউ আলিপুরে। একটু ভেতর দিকে, বাস থেকে নেমে রিকশা নিয়ে যেতে হয়।

দুপুর নাগাদ কাকার বাড়ির কাছে পোঁছে দেখি বাড়ির সামনে মস্ত জটলা। আফটারনুনে রিটায়ার্ড রিকশাওয়ালা, বাকসো হাতে নাপিত, চাবির গুচ্ছ হাতে চাবিওলা, ছোট খুকির হাত ধরে বিস্ফারিত নেত্র অন্ধ ভিক্ষেওলা এবং অগুন্তি ঝাড়া হাত-পা ভিড় করনেওলা—রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দুপুর রোদে উর্ধ্বমুখী তপস্যা করছে। কারুর মুখে রা নেই। ব্যাপার কী?

কিছু দেখছে। কী দেখছে?

আরে সর্বনাশ। এ কী কাণ্ড?

কাকার বাড়ির পাশের উঁচু পাঁচিলে মই লাগিয়ে চড়েছেন পক্বকেশ এক বৃদ্ধ, তাঁর পরনে কেবল একটি আজানু লম্বিত গামছা, এবং একগুচ্ছ উপবীত। এবং হাতে একটি দীর্ঘ বাঁশ। বাঁশটা দিয়ে নিষ্ঠাভরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উনি আমার কাকার দোতলার ঘেরা বারান্দার একটি জানলার কাচের সার্সি ভাঙবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু ওঁর হাতের টিপ ভালো নয়। এবং জানলাটার খিল দেওয়া নেই বলে সেটা বাঁশের খোঁচায় সরে সরে যাচ্ছে। রেজিসট্যান্স নেই, কাচও ভাঙা যাচ্ছে না।

এই রোমহর্ষক দৃশ্যে পথচারীদের মহা উৎসাহ এবং কারুর কোনো উদ্বেগ আপত্তি নেই। এমন কি কাকার বাড়ি থেকেও কাক-পক্ষীটির সাড়া শব্দ হচ্ছে না। এই মহতী জনসভা ও তার সভাপতিকে দেখে বেশি কিছু ভাববার আগেই আমি শুনতে পেলুম রিকশায় বসে বসেই আমি বিকট চেঁচাচ্ছি:

—অ কাকা। অ কাকীমা। তোমরা কি সব মরে গ্যাছো নাকি? এই লোকটা যে তোমাদের জানলাদরজা সব ভেঙে ফেললে—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোতলার বারান্দায় দৌড়ে এলেন কাকীমা, ময়দা মাখছিলেন, দু হাতে ভিজে ময়দার তাল আর দু চোখে বিশ্বের বিস্ময়।

বেরিয়েই কাকীমা ফ্রিজ শট।

তারপর শুরু হল স্লো মুভমেণ্ট। এবং সাউনড।

প্রথমে সস্নেহে—খোকা এসে গেছিস? আয় ভেতরে আয়। তারপর বজ্রনির্ঘোষে—বলি ও জগমোহনবাবু। ওটা কী হচ্ছেটা কী শুনি? বাঁশটা ফেলে দিন।

কাকীমার বাজখাঁই আওয়াজে কেঁপে উঠে জগমোহনবাবু, পাঁচিলের ওপর থেকে পড়তে-পড়তে বাঁশের সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে ভার-সাম্য সামলে নিলেন। দর্শকদের মধ্যে বাঃ বাঃ শব্দটা শোনা না গেলেও অনুরূপ ভাবখানা ফুটে উঠল। রাস্তায় যারা দড়ি-হাঁটার খেল দেখায় তাদেরও লজ্জা দিত জগমোহনবাবুর ঐ চকিত-চমকিত পটুত্ব।

জবাব না দিয়ে উনি বেশ আস্থার সঙ্গে পুনরপি স্বকর্মে মনোনিবেশ করলেন। কাকীমা এবার ধমক লাগাল :

—"নামুন বলছি এক্ষুনি পাঁচিল থেকে। পড়ে যাবেন যে। বাঁশটা ফেলে দিন।"

জগমোহনবাবু মূর্তিমান বিদ্রোহ। বাঁশও ফেলেন না, নামারও নাম নেই।

—তবে রে? দাঁড়ান তো দেখাচ্ছি মজা—কাকীমা সবেগে ঘরে ঢোকেন এবং ময়দার তাল রেখে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বাঁশের ডগাটা চেপে ধরে ফেলেন। বাঁশ ধরে টানাটানি শুরু হতেই পাঁচিলে-দাঁড়ানো জগমোহন বাঁশটি ছেড়ে দেওয়াই মনস্থ করেন এবং হাঁকেন "হরি!"

অমনি জটলা থেকে একটি হাফপ্যাণ্ট পরা কিশোর ছিটকে চলে আসে পাঁচিলের সামনে। জগমোহন এবার হাঁকেন :

—"মই!" ছেলেটা গিয়ে মই চেপে ধরে। বীরপদক্ষেপে জগমোহন নামেন। নেমেই বলেন—

"ও-কাচ আমি ভেঙে দেবুই!" ডান হাতে ঘুষি পাকানো। ঘুষির বদলে চোখ পাকিয়ে বাঁশটা তুলে নিতে নিতে কাকীমা বলেন—"ভেঙে দেখুন না একবার। অন্যের প্রপার্টি আপনি ভাঙলেই হলো?"

—"বলি বাঁশটা নিয়ে নিচ্ছেন যে? বাঁশটা কি আপনার প্রপার্টি?"

—"যারই হোক এটা দিয়ে আমার কাচ ভাঙা হচ্ছিল। এটা আপনার জরিমানা।"

—"জরিমানা মানে? কাচ তো ভাঙে নি? ভাঙলেও জরিমানা নেই। ওটা ভাঙা আমার রাইট।"

এবার কাকীমার আত্মবিশ্বাস টলে যায়।

—"অন্যের কাচ ভাঙা আপনার রাইট?"

—"বলি মাসটা কি? খেয়াল আছে কিছু?"

—"মাস দিয়ে কী হবে?"

—"হবে, হবে। কী মাস এটা?"

—"মার্চ মাস বোধহয়। নারে খোকা?"

—"মার্চ ফার্চ নয় বাংলায় বলুন। কোন মাস?

—"চৈত্র।"

—"তবে? জেনেশুনে চোত মাসে আপনি জানলা খুলে রাখবেন, আর আমার ভাঙবার রাইট নেই?"

"চোত মাসে জানালা খোলা যাবে না কোন্ পঞ্জিকায় এমন বিধান আছে শুনি?"

—"রসিকতা ছাড়ুন। বলুন দিকি চোত মাসে কী হয়?"

এবার কাকীমা স্পষ্টত মুশকিলে পড়েন। চৈত্র মাসে তো কতো কী হয়।

—"কী হয়? মেলা? চড়ক? গাজন? নীলের উপোস? গোষ্ঠ?

বর্ষ শেষ উৎসব ? রবীন্দ্রজয়ন্তী ? কখনো কখনো দোলও হয়—” জগমোহনবাবু কেবলই মাথা নাড়েন।

শেষে বলেন—“আপনার মাথা আর মুণ্ডু। চোত মাসে কালবৈশাখী হয়। আর কালবৈশাখী হলেই আপনার ঐ জানলার কাচগুলো সব ভেঙে ভেঙে আমার প্রপার্টিতে পড়বে। আর আমরা আনপ্রিপেয়ার্ড ইনোসেণ্টলি ঐ ভাঙা সার্সির টুকরোয় পা দিয়ে ফেলে রক্তগঙ্গা হবো। দেখতেই পাচ্ছেন আপনার ঝুলবারান্দার জানলার পাল্লা আমার গলির ওপরে খুলেছে। ও-জানালা আমি যদি ভাঙি, আমি লিগ্যালি ও-কে, বুঝেচেন ? নইলে আর দিনদুপুরে, একগঙ্গা লোকের সুমুখে···হুঁঃ। শুনুন, নিজের প্রপার্টিতে এসে পড়া ফরেন জিনিস আমি নিশ্চয় ভেঙে দিতে পারি। যেমন গাছের ডালপালা। তেমনি জানলার পাল্লাই বা নয় কেন ? ভেবেচিন্তে আগে থেকেই ভেঙে রাখলে আর পরে যখন-তখন কাচ ভেঙে হাত-পা কেটে উনডেড হবার ভয় থাকবে না। ওই দেখুন। প্রিপারেশন কমপ্লিট।” গলির দিকে আঙুল দেখালেন। চেয়ে দেখি গলিতে রেডকার্পেটের মতো করে চট বিছানো।

—“কাচ ভেঙে ওইতে পড়বে ওইতে করেই গুটিয়ে নিয়ে গিয়ে কাবাডিওলাকে বেচে দেবে। এবার বাঁশটা দিয়ে দিন। কাচটা ভেঙে ফেলি।” জগমোহনবাবু কনফিডেণ্টলি হাত বাড়িয়ে দেন ওপর দিকে।

দুই চক্ষু কপালে তুলে, ময়দা মাখানো হাত গালে দিয়ে কাকীমা বললেন—

—“অ। বুঝিচি। কবে কালবৈশাখী উঠবে, তখন যদি আমার জানলা খোলা থাকে, তবে কাচ ফাটতেও পারে আর সেই ফাটল যদি বাড়ে তবে একদিন সার্সি ভেঙে যেতে পারে, আর সার্সি ভাঙলে সেই কাচের টুকরো আপনার গলিতে খসে পড়তে পারে আর আপনি সেই ভাঙা কাচের ওপরে ইচ্ছে করে চোখ বুজে, জুতো খুলে হেঁটে চলে বেড়িয়ে আপনার পা কেটে ফেলতে পারেন। তাই আগে থেকে সতর্ক

হয়ে আপনি আমার নতুন জানলার সার্সিগুলো বাঁশ দিয়ে ভেঙে রাখছেন ? বা, বেশ বেশ।

আজ বাদে কাল আপনার ছেলেটা বড় হবে, আমার মেয়ে তদ্দিনে বিদেশ থেকে ফিরতে পারে, আপনার ছেলে তার সঙ্গে ঘুরে টুরে বেড়াতে চাইতে পারে, সে বড় কেলেংকারি হবে, আমিও বরং সাবধান হই। আপনার ছেলের হাত-পাগুলো এইবেলা ভেঙে রাখি ? তখন আর কষ্ট করে গুণ্ডা-টুণ্ডা লাগাতে হবে না ?”

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে জগমোহনবাবু বললেন, “এই তো আপনাদের লীগ্যাল নলেজ না থাকার ফল। ভুল অ্যানালজি ভুল আরগুমেণ্ট, সব ভুল। দুটো কেস মোটেই এক নয়। যা বললেন তেমন কেস যদি হয় তখন লীগ্যালি যা যা করার আমি তা করব। সে যাক। আপনাদের জানলাটা আমি ভাঙবই। আজ না হোক কাল। দিনে না হোক রাতে !”

—বলে গটমট করে বাড়িতে ঢুকে গেলেন জগমোহনবাবু। এতক্ষণ মই ঘাড়ে হরি অপেক্ষা করছিল, পেছু পেছু সেও ঢুকল।

কাকীমা একটু বাদে শপথ কঠিন স্বরে বলেন,

—“কী করে কেউ ভাঙে আমার জানলা, আমি দেখব। জানলাটা খুলবোই না।” আশ্চর্য ! ও-বাড়ির জানলা থেকে জবাব চলে এল চটপট—“জানলা যদি নাই খোলে কেউ তবে আমিই বা ভাঙবো কেন ? আমার প্রপার্টির ওপরে ইনফ্রিনজমেণ্ট না হলে তো লীগ্যালি আমি অন্যের জানলা ভাঙতে পারি না ?” জগমোহনবাবুর পেছনে হরিও উঁকি মারছে।

—“লীগ্যালি কখনো কেউই কারুর জানলা ভাঙতে পারে না ”—এতক্ষণে আমি আসরে নামি। “আপনি তখন থেকে যা-তা বলছেন।”

—“পারে মশাই পারে। ওসব আপনি বুঝবেন না, বড় জটিল তত্ত্ব। লীগ্যাল সেন্স ইজ নট কমনসেন্স বুঝলেন ? তারপর কাকীমার দিকে আঙুল দেখিয়ে—“উনি তো আরোই বুঝবেন না, একটি ঘোর

অশিক্ষিত মূর্খ স্ত্রীলোক বৈ তো নন ?" মুহূর্তের মধ্যে পিছন ফিরে দৌড়ে জানলা থেকে অন্তর্হিত হন জগমোহনবাবু চট করে কাকীমাকে মন্দ কথাটি বলেই। পিছন পিছন দৌড়য় হরিও। জানলা ফাঁকা। কেবল একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল পড়ে আছে।

এবার আমি ভয়ানক রেগে উঠি। ব্যাটা কাপুরুষ। কাকীমা কিন্তু রাগেন না! হেসে ফেলেন। এবং আমাকে টেনে ঘরে নিয়ে যান।

—"দূর দূর। ও-পাগলের সঙ্গে কথা বলে কী হবে খোকা ? ওটা কি মানুষ ? তবে জানলাটা সত্যি সামলে সুমলে খুলতে হবে! পাগলাকে বিশ্বাস নেই। তুই না এসে পড়লে হয়তো আজই দিত ভেঙে।"

—"পাগলা মানে ? এদিকে আইন-বুদ্ধিটা তো টনটনে। শেয়ানা পাগল।"

—"পাড়ার ছেলেরা ওকে পাগলা-জগাই বলে ক্ষ্যাপায়। আর ও তখন ছাতাটা তুলে ওদের মারতে ছোটে।"

কাকা স্নান করে বেরিয়েছেন। ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললেন—

—"লোকটা কিন্তু সত্যি সত্যি উকীল। রিকশাওলা, ফিরিওলা, ইঁটপাতা নাপিত ওদের কী সব লাইসেন্স-টাইসেন্স করিয়ে দেয় কোর্ট থেকে। ওরা তো ওকে উকীলবাবু বলেই ডাকে। ও দিব্যি ফ্রী চুল-দাড়ি কাটিয়ে নেয়। বাসস্টপ থেকে বাড়ি অবধি ফ্রী রিকশা চেপে আসে। এক ইমপসিবল ক্যারেকটার। জগমোহনবাবুর কাণ্ড-কারখানা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না রে খোকা। এই নিউ আলিপুর তল্লাটে ওরকম গামছা পরা বাড়িওলা ফুটপাতের উকীল তুই আর দুটি পাবি না।"

সারাদিন কেবল জগমোহনবাবুর কীর্তিকলাপ শুনতে শুনতেই কেটে গেল। সত্যি সেলুকাস সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার মতন বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তি। আমার কাকা মোটেই পরচর্চা করার টাইপ নন, কথাই বলেন তিনি অতি সামান্য। সেই কাকাই শুরু করলেন জগমোহন প্রসঙ্গ :

—"এই ফাঁকা প্লটটায় বাড়ি করে অবধি জগমোহনবাবু আমাদের পাড়াসুদ্ধ প্রত্যেকের পেছনে উড়িবেড়ি দিয়ে লেগেছেন। কেবল কি আমার সঙ্গেই ? মোটেই না। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে পেছনে যে যেদিকে আছে প্রত্যেকের ওঁর সঙ্গে ঝগড়া। ওঁর সরু লম্বাটে এক চিলতে জমি পড়েছে মাঝখানে, এধারে পাশাপাশি আমরা দু বাড়ি, আমি আর ডকটর ধর, ওপাশে সামনে দিকের ছোট প্লটে সেনগুপ্তরা, আর পেছন দিকের বড় প্লটে ঐ দশতলা বাড়ি উঠেছে আর ওর পেছনে পুরো উত্তরদিকটা জুড়ে আছেন হৈমন্তী দেবী, তোদের ফিলিম স্টার। জগাই প্রত্যেকটি বাড়ির সঙ্গে কিছু না কিছু বাধিয়ে রেখেছে।

"তুই আজ স্বচক্ষে দেখলি, তাই। নইলে আমি যদি থানায় ফোন করে বলি, বেলা বারোটার সময়ে পাঁচিলে চড়ে বুড়ো জগমোহন-বাবু বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে ইচ্ছে করে আমার জানলার সার্সি ভাঙছেন, তুই কি মনে করিস পুলিস আসবে ? ওর ওটাই মজা। এমন কাণ্ড করে চোখে না দেখলে, কানে শুনে কারুর বিশ্বাস হবে না। তোর "কাকীকে জিজ্ঞেস কর, সব বলবে।"

কাকীমা বললেন—"কত বলব ? কত শুনবি ? কোন্‌টা দিয়ে শুরু করব ? এই ধর সেদিন সেনগুপ্তের মেয়ের বিয়ের ঘটনাটাই। গায়ে-হলুদ হচ্ছে, ছাদে মেয়েরা সবাই গেছি, কোথায় যেন ক্যাচর-ক্যাচর করে একটা শব্দ হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। কিসের শব্দ ? কিসের শব্দ ? শেষে দেখা গেল জগাই এই ঠিক আজকের মতো মই নিয়ে পাঁচিলে চড়েছে, চড়ে, একটা কাটারি দিয়ে সেনগুপ্তের ম্যারাপের বাঁশের ডগাগুলো কুপিয়ে কুপিয়ে কাটছে। সেনগুপ্ত ছুটে গেল। ওকী মশাই ! ওকী মশাই।"

জগা বললে—ওই সব বাঁশের ডগারা কেন ইললিগ্যালি জগার বাড়ির গলির মধ্যে বেরিয়ে রয়েছে ? সেনগুপ্তের বাড়ির সীমানা পেরিয়ে ? জগা তার গলির সীমানার মধ্যে অন্যের বাঁশের খোঁচা বেরুনো কখনোই সহ্য করবে না। তাই বাঁশের একটা বেআইনী ডগাগুলোকে সে কেটেকুটে প্লেন করে 'লীগ্যাল' করে দিচ্ছে !

খানিকটা করে বাঁশ যেই কেটে ফ্যালে অমনি টুকরোটার সঙ্গে হাতের কাটারিখানাও খসে পড়ে গলিতে। জগা নিজেও পড়ো পড়ো হয়। কিন্তু বুড়োর ব্যালান্স কী। মারাপটা ধরেই সামলে নিচ্চে। আর গলির ভেতরে নিরাপদ দূরত্বে মুণ্ডুটি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রামভক্ত হনুমানের মত ঐ হরি, জগার একমাত্র পুত্র। পড়ে-যাওয়া কাটারিটা ভক্তিভরে বাপের হাতে তুলে তুলে দিচ্ছে। কাটারিটা ভোঁতা হয়ে যেতেই রান্নাঘর থেকে মায়ের আঁশবটিটা এক ছুট্টে এনে দিলে। ওঃ সেদিন জগাইকে থামানো না গেলে কী সর্বনাশই হতে যাচ্ছিল ভেবে ছ্যাখ ? এভাবে বাঁশ ছেঁটে দিয়ে প্যানডেলের পুরো ব্যালান্স আপসেট হয়ে যাচ্ছিল। বেশ কিছু দড়িদড়াও খুলে গেছিল, সব বাঁধন-টাধন আলগা হয়ে, বিশ্রী ব্যাপার।

"আরেকটু হলেই প্যাণ্ডেলটা ভেঙে পড়তো লোকজনের মাথার ওপরে আলো—পাখা-টাখা সুদ্ধু। কী কেলেঙ্কারী হতে যাচ্ছিল ভাব একবার ? আমারই তো কান্না পেয়ে গেছল সেনগুপ্তের অবস্থা দেখে। দমকল ডাকবে, না পুলিশ ডাকবে, ভেবেই পাচ্ছে না—কী উপায়ে জগাকে আটকাবে।"

কাকা বললেন—"জগা যা করে সব সে আইন বাঁচিয়ে করে। ব্যাটা উকীল হয়েছিল যেন কেবল এই সব বেয়াক্কেলে বজ্জাতি করবার জন্যেই। উঃ পাড়ার লোকের হাড়ে দুব্বো গজিয়ে দিলে।"

আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি—"তারপর ? তারপর ? শেষ পর্যন্ত থামানো হলো কেমন করে ওকে ?"

—"কেমন করে আবার ? পাড়ার ছেলেরা মার-মার শব্দে তেড়ে এল যেই হকিস্টিক নিয়ে, তক্ষুনি বাঁশ কাটা বন্ধ হয়ে গেল। সেই থেকে সেনগুপ্তের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই।" বলে কাকা চুরুট বের করলেন।

—"মুখ দেখাদেখি কার সঙ্গেই বা আছে ?" কাকীমা বললেন—"ওপাশের হৈমন্তী দেবীর ব্যাপারটাও বলো খোকাকে।" কাকা চুরুট ধরাতে ব্যস্ত ছিলেন—বললেন—"তুমিই বলো।"

—"হৈমন্তীদের সঙ্গে আরেক কাণ্ড।" কাকীমা মহোৎসাহে শুরু করলেন। হৈমন্তী তো ফিলিম স্টার, গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না, পাড়ার সব যেন লোক না পোক, কারুর সঙ্গেই যাতায়াত নেই। বাড়িটা মস্ত কম্পাউণ্ডে ঘেরা আর কম্পাউণ্ডের চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের মাথার ওপর তারের জাল, আর সেই জালের গায়ে খুব সুন্দর কী একটা স্পেশাল ফুলের লতা লাগানো। যেমনি সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি তার গন্ধ।

"হৈমন্তীদের বাড়িটাকে পুরো যেন বোরখা পরিয়ে রাখে ঐ লতার বেড়া। ডকটর ধরের বাড়ির গায়েও ঐ কমন উত্তরের পাঁচিল পড়ে, জগার বাড়ির গায়েও। ধরসায়েবরা তো সব সময়ে ঐ ফুলের গন্ধের কথায় বলেন—বিদেশী একটা রেয়ার ফুল, ফোকটে দিব্যি গন্ধটা এনজয় করতে পারছি—" আমার হিংসেরই জয় মাঝে মাঝে।

"হঠাৎ হলো কী, হৈমন্তীর মালী দেখে জগার বাড়ির গায়ের লতাটা কেবলই ঝামরে পড়ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, ফুলসুদ্ধু লতা মরে মরে যাচ্ছে। শুকোতে শুকোতে ঐদিকের পাঁচিলের গা থেকে লতা খসে পড়তে লাগলো। হৈমন্তীদের বাড়ির আব্রু গেল ঘুচে। বাগানের পার্টি-ফার্টি সব দেখা যায় জালের ফাঁক থেকে। গাছে পোকা ধরলো, না কী যে হলো কিছুতেই বের করতে পারে না মালী। হৈমন্তী তো মালীর ওপরে খাপ্পা, প্রিভেসি থাকছে না তার বাড়ির।"

—"ফিলিম আর্টিস্টের রহস্যময়তা নষ্ট হয়ে গেলে আর রইল কি?" কাকা ফোড়ন কাটেন।

—"এদিকে জগার বউয়ের খুব মজা, সে তার মেয়েদের নিয়ে দোতলার ছাদে উঠে দূরবীন লাগিয়ে হৈমন্তীর বাড়ির ভেতরের কাণ্ড-কারখানা দেখছে মনের সুখে। মালী বেচারাই পড়ল মুশকিলে—খুব ভাবনা তার। বেছে বেছে ঐটুকু অংশের লতাই বা মরে যাচ্ছে কেন? আবার নতুন লতা লাগিয়ে দিলে, আবার কদিন যেতে না যেতেই, যেই একটু বেড়েছে অমনি লতাটা ঘাড় মুখ গুঁজে নেতিয়ে পড়লো। ব্যাপারটাও বোঝা গেল এবারে।

"জগা প্রতিদিন ইয়া বড়া এক কাঁচি নিয়ে ওই মইতে চড়ে, তারের বেড়ার এদিক থেকে কচ কচ করে লতার গুঁড়িগুলো কেটে রেখে দিচ্ছে। গাছ মরবে না তো কি ?

"ব্যাপার শুনে হৈমন্তীর সেক্রেটারি তো দৌড়ে এলো কোমর বেঁধে ঝগড়া করবে বলে। সেক্রেটারিরই বা চাল কী ? হাতে বিলিতি পাইপ, গলায় বাহারে বেনারসী টাই।

—"জগা স্বীকার করলে, হ্যাঁ, সে রোজ দাড়ি কামানোর সময় নিয়ম করে লতাটা কেটে দেয়।"

—"কেন না ওতে এ বাড়ির স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। আলোবাতাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতো উঁচু বেড়া দেওয়া বেআইনী কাজ। বেআইনী বেড়া জগা থাকতে দেবে না।"

—"কই অন্যেরা তো আপত্তি করেন নি ? ধরসায়েব তো এত বড় ডাক্তার, তিনি তো কই বলেন নি যে লতাটা অস্বাস্থ্যকর ?"

—"জগা বললে ধরসায়েব যাই বলুক। সেটা জগার বেলাতে প্রযোজ্য নয়। অনেকে তো ডাস্টবিনের খাদ্যও কুড়িয়ে খায় ? তারা ওটা অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করে না।"

—"ধরসায়েবের আলোবাতাস না লাগতে পারে। জগার লাগবে।"

"তখন সেক্রেটারি বললে—কিন্তু ওটা তো উত্তর দিক—উত্তুরে বাতাস না এলে এমন কি লোকসান হবে স্বাস্থ্যের দিক থেকে ? আর আলোর কথাই যদি ওঠে, তবে পূবদিকটা অন্ধকার করে ওই যে দশতলা বাড়ি উঠছে। কই সেটা কি জগা কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে পারছে ?

"এর উত্তর না দিতে পেরে জগা খেপে টং হয়ে বললে—বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে, ফের প্যানপ্যান করলেই দোবো কেস ঠুকে !"

"এই বলে ছাতিটা তুলে তেড়ে গেল হৈমন্তীর সেক্রেটারিকে।"

আমি খুব ইমপ্রেসড।—"বড়লোকের নোকরকে ছাতি তুলে তেড়ে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। গাটস আছে বলতে হবে।" কাকা বলেন,

—"ও তো পাগলের গাটস। তেড়ে গেলে কী হবে? টাকার জোর যার তার সঙ্গে পারবে কেন? জগার "কেস-ঠুকবো"-তে ঘাবড়ে না গিয়ে সেও দিয়েছে মুখের মতন জুতো। জগার বাড়ির অংশটুকুতে তাদের বেড়ার বদলে খাড়া কংক্রিটের দেওয়াল তুলে দিয়েছে বিশাল উঁচু করে। এখন সত্যি সত্যি আলোবাতাস আটকে গেছে বেচারার। ভাঙতেও পারছে না। বুঝছে ঠেলাখানা। অকারণে অন্যের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার ফল।"

—"তবুও বিশ্বাস নেই কাকা" আমি বলি—"উনি যেমন মানুষ মনে হচ্ছে, একদিন দিলেন হয়তো ডিনামাইট বসিয়ে পাঁচিল উড়িয়ে। জেদ যদি চাপে।"

—"তা খুব ভুল বলিস নি খোকা।" কাকা নির্বিকার গলায় মন্তব্য করেন—"তাও জগা পারে। কিছুই ওর পক্ষে অসাধ্য নয়। ডকটর ধরের বাগানে তো আগুনের গোলা ছুঁড়ছিল কদিন আগেই।"

—"সে কি কাণ্ড!"

—"আর বলিস কেন? ভাগ্যিস উঠোনে কেউ ছিল না। কিন্তু ভিজে কাপড় শুকুচ্ছিলো! ভাগ্যিস ভাল করে নিংড়োনা হয়নি, ভিজে জবজবে ছিল তাই রক্ষে। যদি কাপড়গুলো শুকিয়ে যেতো তবে কী ঘটতে পারতো ভাব দিকিনি একবার? অগ্নিকাণ্ড হতে হতে বেঁচে গেছি সবাই। গায়ে গায়ে লাগোয়া সব বাড়ি।"

—"আগুনের গোলা? তার মানে?"

—"তার মানে বোঝা রীতিমতো শক্ত বাছা!"

—কাকীমা পুনরায় আসরে নামেন।—"ধরগিন্নির কাপড়খানা পুড়ে এই এত বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পুড়েছে, আগুন যে ধরে যায়নি, এই বাঁচোয়া। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে আমিই প্রথম দেখতে পেলুম যে ধরদের উঠোনে বড় বড় আগুনের বল এসে পড়ছে। চেঁচামেচি করতেই ধরগিন্নি বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন জগা তার বাড়ির গলিতে দাঁড়িয়ে শুকনো পাতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে গোল্লা পাকাচ্ছে,

তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়াল টপকে এদিকে ছুঁড়ছে। ধর-গিন্নি বললে—

—"একী কাণ্ড ? একী হচ্ছে ? একী সর্বনেশে ইয়ার্কি ।"

—"ইয়ার্কি কে বললে ? আপনাদের গাছের পাতা ঝরে ঝরে আমার ঘরদোর নোংরা করছে। তাই আপনার সাধের গাছের পাতা আবার আপনাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

—"তা আগুনটা কেন ?

—"ওটা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, একসট্রা। গাছটা এদিক থেকে আমি তো কেটে ফেলতে পারবো না, ওটা আপনাকেই কাটতে হবে।"

ধরগিন্নি বললেন—"কক্ষনো গাছ কাটবো না।"

জগা বললে :

"অবিলম্বে কাটুন। না যদি কেটেছেন, আর পাতা যদি আরও পড়েছে, তবে কিন্তু আমি ফের পাতার ডেলা পাকিয়ে ছুঁড়বো এবারে বিকেলের দিকে। ঠিক কাচা কাপড় যখন শুকনো।"—

"বাপরে বাপ। কী লোক।" আমি না বলেই পারি না।—"ডকটর ধর কী করলেন ?"

—"করবেন আবার কি ? গাছটা সত্যি সত্যি কাটিয়ে ফেললেন। বলা তো যায় না আগুন লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ ? যা ডেনজারাস ব্যক্তিটি। সেই থেকে ধরদের সঙ্গেও আদায় কাঁচকলায়।"

—"কিন্তু ও যা চায় তাই পেয়ে যাবে ? কুচক্রী আর পাগলাটে বলে।"

—"কোথায় আর পাচ্ছে ? ওই তো হৈমন্তী মুখের ওপর দেড়তলা দেয়াল তুলে দিলে আলোবাতাস আটকে। আমরাও কি আর গ্যারাজটা তুলি নি ?"

—"তার মানে ?"

—"যখন গ্যারাজটা বানানো হচ্ছে···মানে তোর কাকার তো আগে গাড়ি ছিল না,"—কাকীমা শুরু করলেন,

—"এখন গাড়িটা কিনেছেন গ্যারাজও তৈরি করাতে হলো।

ওমা। রাজমিস্ত্রিরা এসে আমাকে বললে, "এক বাবু কাম সব গড়বড় কর দেতা হ্যায়, বহুত হল্লাগুল্লা করতা, কাম করনে নেহী দেতা।" কী ব্যাপার? গিয়ে দেখি, দু হাতে কোমরে গামছাটি চেপে ধরে জগাই ছুটে পালাচ্ছে। সদ্য-গড়া দেওয়ালটুকু লণ্ডভণ্ড ভাঙা। ইঁট সিমেন্ট সব ছরকুটে আছে। দেখে তো আমার মাথা গরম হয়ে গেল। এত বড়ো আস্পদ্দা? আমার বাড়িতে ঢুকে আমার দেওয়াল ভেঙে দেওয়া? এ আবার কোন আইনে চলে? তোর কাকাকে গিয়ে বললুম। কাকাও তেমনি। তিনি জগাকে গিয়ে বললেন—

—"কী মশাই? আপনি নাকি আমার গ্যারাজের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে পালিয়ে এসেচেন?"

—"পালাবো কী জন্যে? দেখতেই পাচ্চেন আমি নিজের বাড়িতে বসে রয়েচি।"

—"আমার গ্যারাজ ভেঙে দিয়ে এসেচেন কি না?"

—"তা দিইচি।"

—"কেন, বলতে পারেন?"

—"ওটা ইললিগ্যাল কনস্ট্রাকশন। করপোরেশনকে খবরটা দিলে, ওরাই এসে ভেঙে দেবে। আমি বরং আপনার পয়সা বাঁচাতে আগেই ভেঙে দিচ্ছিলুম।"

—"আপনার মাথা। আপনার আইনের নিকুচি করেছে। নিজের তো গ্যারাজ করেন নি, ওই আইনগুলো আপনার জানা নেই।"

—"খুনের সাজা কী, তা জানতে নিজে খুন করবার দরকার হয় কি?"

—"থামুন মশাই, কবে আইন পড়েছিলেন, সব ভুলে মেরে দিয়েছেন, পড়ুন গে আপনার লয়ের টেকসট বইগুলো আরেকবার করে। আইনে বলে আমার বাড়িতে আমি এগারো ফুট পর্যন্ত উঁচু গ্যারাজ করতে পারি, বুঝলেন? যা পারি, তাই করচি। করবও। বেশি ঝঞ্ঝাট করলে পুলিশ ডাকবো।" নিজের বুকে টোকা মেরে জগা বললে— "পুলিশ? সেও এই আইনেরই চাকর, বুয়েচেন?"

পরদিন জগা একটা টিনের চেয়ার পেতে ওর দিকের গলিতে এসে বসলো। হাতে একটা এলুমিনিয়মের গজফিতের কৌটো। যেন আমাদের কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজার। মিস্ত্রিরা দেওয়াল গাঁথে আর মাঝে মাঝে রোককো বলে লাফিয়ে এসে পিড়িং পিড়িং করে কৌটো থেকে স্প্রীংয়ের গজফিতে বের করে জগা এসে হাইট মাপে। এগারো ফুট হতে-না-হতেই—ব্যাস-ব্যাস স্টপ-স্টপ করে সে কী চেঁচামেচি।"

কাকা এইবার যোগ দিলেন—

—"শুধু কি তাই? ওই দেয়ালটুকু তুলতে আমার ডবল খরচা করিয়ে দিয়েছে। জগার জন্যে মিস্ত্রিরা দু দিনের কাজ চারদিনে করে ডবল রোজ নিয়েছে। ওরা কাজ করবে কি, পাঁচিলের ওপাশে। জগা ওঁৎ পেতে বসে আছে চেয়ার পেতে।

গলিতে যেই একটু বালিসিমেণ্ট ঝরে পড়েচে অমনি জগা চেঁচাচ্ছে—এ্যাইও! ইধার আও। আভী ময়লা সাফ করো। আমার গলি নোংরা হচ্ছে। মিস্ত্রিরা যত বলে এখন একটু অমন পড়বেই, দিনের শেষে গিয়ে একসঙ্গে সব ধুয়ে মুছে দিয়ে আসবো,—তা চলবে না। জগা হোল-ডে চেয়ার পেতে বসে দেয়াল মাপছে, আর এ্যাইও—করে চুনসুরকি তোলাচ্ছে ওর গলি থেকে। সে কী অত্যাচার, তোকে কী বলবো।"

কাকার মত স্বল্পভাষী মানুষের মুখে এত কথা শুনে সত্যি সত্যি অবাক লাগছিল। কতটা তিতিবিরক্ত করলে তবে মানুষকে এতটা বদলে ফেলা যায়। চায়ের সময়ে সবাই বারান্দায় বসেছি—জগার বাড়ির দোতলার দিকে চোখ পড়ে গেল। দোতলাটা অদ্ভুত দেখতে। আধখানা সম্পূর্ণ হয়েছে, আধখানা হয় নি। কেমন খাপছাড়া মতন হয়ে, শ্যাওলা ধরে যাচ্ছে। ছাদটাতে বেখাপ্পা এ্যাজবেস্টস আধখানা দেওয়ালের ইঁট বের করা বাকী আধখানা প্লাস্টার করা। এখানে টিন, ওখানে ত্রিপল দিয়ে জোড়াতালি মারা এক কিম্ভুত চেহারা। অথচ একতলাটা বেশ সুন্দর।

—"আচ্ছা কাকীমা, অমন তালি-তাপ্পি মারা কিম্ভুত চেহারা কেন

জগমোহনবাবুর দোতলার? অমন আধখ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে রয়েছে কদ্দিন ধরে? ওটা উনি কি কমপ্লিট করবেনই না? ছ্যাৎলা ধরে যাচ্ছে যে।"

কাকা-কাকীমার একবার চোখাচোখি হলো। কাকা চুপ। কাকীমা ইতস্ততঃ করে বললেন—

—"ওকথা আর বলিসনি। সে এক বৃহৎ কেলেঙ্কারি।"

—"মনে পড়লে রাগও হয়, দুঃখুও হয়।"

—আশ্চর্য মানুষ বটে একটা, কাকা আবার ফেটে পড়লেন— "হোল ফ্যামিলিটাকে নষ্ট করছে।"

—"কেন কাকা?"

—"কেন আমি বলতে পারবো না, আমার ভাবলেই চড়চড় করে প্রেশার চড়ে যেতে থাকে। ও তোর কাকীর কাছে শুনিস। বলে কাকা উঠে গেলেন। কাকীমার দিকে প্রশ্নসূচক চোখে তাকাতেই কাকীমা শুরু করলেন,

—"সত্যি, ব্যাপারটা এমন বিশ্রী না—তোর কাকা ওই প্রসঙ্গটাই সইতে পারেন না। ঐ যে ওপাশের দশতলা বাড়িটা দেখছিস না, ওইটে যখন উঠছে জগমোহনের দোতলাটাও সেই সময় উঠছিল। ঝরঝর করে দিব্যি লিন্টেল অবধি উঠে গেল, এমন সময়ে একদিন রাত্তিরে পাড়ায় প্রবল হইচই। দশতলা বাড়ির দরওয়ানরা চোর ধরেছে।

"কী ব্যাপার? পাড়াসুদ্ধু ভেঙে পড়লো চোর দেখতে। তোর কাকাও গেসলেন। দরওয়ানদের ঘরে এক অপূর্ব দৃশ্য। বেঁটেখাটো এক নেপালী দরওয়ান দু হাতে জাপটে ধরে আছে বিপুল বপু জগা-গিন্নিকে। জগা-গিন্নি যেন পাথর। মুখে একটিও শব্দ নেই। মাথায় এক হাত ঘোমটা। হাতে এক বালতি সিমেন্ট। আর গলিতে সারবন্দী বালতি ভরে ভরে সিমেন্ট, বালি, চিপস সাজানো আর নীচু পাঁচিলের মাথায় থাকে থাকে ইঁট রাখা। পাঁচিলের ওধারে জগা। নিজের উঠোনে দাঁড়িয়ে খুব লম্ফঝম্ফ করছে। পরনে গামছা। হাতে বালতি। এ বাড়িতে না-এসেই চেঁচাচ্ছে—

"এ্যাইও। ছোড় দো আমার পত্নীকো। কার হুকুমে ওসকো পাকড়ায়া? কোন সাহসে তুম উসকো গায় হাত দিয়া? রাসকেল কাঁহাকা—আভী হাম কেস কর দেগা তোমাদের প্রত্যেকের নামে—"

এদিকে দরওয়ানরা জগার গিন্নিকে ঘিরে রেখেছে। মোটেই ছাড়ছে না। কেস করবে শুনে বাহাদুর বললে—

—"হাম থোড়াই বিবিজীকো আপকো ঘরসে পাকড়কে লায়া? উও আয়া কিঁউ হমারা ঘরপে?"

—"উনি তো তোমাদের টিউবল থেকে জল আনতে গেছেন—"

—"ইতনী গহরী রাতমে? তো বালটিমে পানী নেহী, সিমেণ্ট কিঁউ?"

—"রাত্তিরে অত দেখতে পায়নি।" জগা ডেসপারেট।

—দরওয়ানরা বললে রোজ রোজ এই কাণ্ড হচ্ছে। এই সব বালতি ভরে উনি পাঁচিলের ওপারে দিব্যি পাচার করেন। ইঁট সিমেণ্ট চুন সুরকী সব কিছু। ওদিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েরা জগমোহনবাবুর নেতৃত্বে। আর পাঁচিলে উঠে বসে এপার-ওপার করে, হরি তার বাবা-মাকে সাহায্য করে বালতি-চালাচালির কঠিন কর্মে।

সে ঝুপ করে নেমে পালিয়েছে। ধরা পড়েছেন কেবল গজগামিনী জগমোহিনী।

—"হররোজ মাল চোরী হো রহা, কণ্ট্রাকটর সাহাব হামলোগকো বহোৎ পরেশানী করতে হেঁ—লেকিন চোর নাহি পকড় যাতা—"

—আঃ, চুরি কেন হবে? জগমোহন হাঁক পাড়ে নিজের বাড়ি থেকে—একে মোটেই চুরি করা বলে না।"

—"রাত মে ঘরকা অন্দর ঘুসকর চীজ উঠাকে ভাগনেকো ক্যা কহ যাতা হায়, বাবুজী?"

—"এ্যাও। একদম চোপ। আভী ছোড় দো হামারা ওয়াইফকো। নইলে আমি এক্ষুনি পুলিশ ডাকবো—"জগা ভাঙে তো মচকায় না। দরওয়ানরাও পুলিশ ডাকতে যাবেই। শেষে পাড়ার সবাই মিলে অতি কষ্টে জগার বউকে বাঁচালে।"

—"তবে যে কাকা বললেন জগমোহনবাবু সর্বদা আইন বাঁচিয়ে চলেন—এর বেলায় তো পুরোই বেআইনী কম্মোটি করলেন ?"

কাকা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন চুরুট ধরিয়ে।

—"বেআইনী হলে কি হবে ? ব্যাটা ঘুঘু, নিজে ঠিক বেঁচে গেছে। সে তো এপাশে মোটে আসেই নি। চুরি করতে নিজে না এসে মোটা বউটাকে পাঠানো কেন ?

"যা বে-আইন পরে পরে। নিজে তো বমাল সমেত গ্রেপ্তার হয়নি ? হয়েছে তার বউ। খুবই চালু লোক।"

—"কী পাজি ছাখো।" কাকীমা বলেন—"বউটাকে জেলে পাঠিয়ে নিজে দোতলা বাড়িতে থাকবার মতলব।"

—"তা কেন ?" কাকা বাধা দেন। "অত সোজা নয়। ব্যাটা আরও কুটিল। বউকে পাঠানোর মধ্যে তার একটা অনুমান কাজ করছিল—এটা একটা চিরকেলে কৌশল। মহাভারতের যুগের। সেই শিখণ্ডী-ট্রিক আর কি। ঠিক ও যেটা আঁচ করেছিল, তাই হলো। যে-জন্যে ওর মোটা থপথপে বউকে দিয়েই চুরি করানো, চটপটে ছোকরা হরিকে দিয়ে নয়,—সেই প্ল্যানও ওর ফেল করল না। ব্যাটা কম চালু ? আমরা পাড়ার কত্তাব্যক্তিরাই গিয়ে দশতলা বাড়ির মালিকদের ধরলুম—জগার বউ বেচারি গিন্নিবান্নি মানুষ, ছেলেপুলের মা, ওকে ধরে চোর বলে পুলিশে দিলে গোটা পাড়ার পক্ষেই বড় লজ্জার কথা হয়। একটা মিটমাট করে নেওয়া ভাল। ওরাও সেটা মেনে নিলে ভদ্রতাবশত। প্রতিবেশী বলে কথা ! দরওয়ানগুলো হৈচৈ করে গিয়ে জগার বাড়ি থেকে ওদের সিমেণ্টের থলে, চুনের কড়া, থাক থাক ইঁট, বস্তা বস্তা বালি সব ফেরত নিয়ে গেল। ফলে ওদের সাধের দোতলাটি আর কমপ্লিট হলো না।"

—"ওখানেই শেষ" কাকী বললেন—"উপসংহারটুকুও শোন। একদিন দেখি দুটো রাজমিস্ত্রী জগার গলায় জগারই ছাতার বাঁট লটকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। প্রাপ্য শোধ করেনি। বলেছিল টাকার বদলে নাকি সিমেণ্টের বস্তা দেবে—তাও দেয়নি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু

ওরা কিছুই করতে পারলে না—কেবল ওর ছাতাটা কেড়ে নিয়েই চলে যেতে হলো ওদের। যাবার আগে জগাকে রাস্তায় রীতিমতো ছাতাপেটা করে গেল। বউ বারান্দা থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। বাধা দিলে না।"

রাত্তিরে খাবার পরে আমরা শোবার উদ্যোগ করছি এমন সময়ে একটা উত্তেজিত তর্কাতর্কি শোনা গেল সরু মোটা দুরকম গলায়। মনে হলো জগমোহনের বাড়িতেই 'গোলমালটা চলছে।—"ও কী হচ্ছে কাকা-কাকীমা? জগমোহনবাবুদের বাড়িতেই মনে হচ্ছে?"

কাকীমা চুপ করে একটু শুনলেন কান পেতে তারপর বললেন—আজ কত তারিখ বল দিকি? মাসের শেষ কি?"

—"মার্চ মাস প্রায় শেষ হয়ে এল—চৈত্রের মাঝামাঝি।"

—"মার্চের শেষ তো?" কাকীমা উৎসাহের সঙ্গে বলেন,

—"চল খোকা তোকে একটা মজা দেখাচ্ছি চল।"

কাকা ব্যস্ত হয়ে আপত্তি করতে থাকেন—"না না ওসব ঠিক নয়, ওসব ঠিক নয়। তোমার যত সব মেয়েলী বুদ্ধি। খবদ্দার ও কুকম্মোটি কোর না—"

কিন্তু কাকার কথায় কান না দিয়ে কাকীমা খড়খড়ি ফাঁক করে জ্বলজ্বল করে জগমোহনবাবুর ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলেন—আমাকেও ডাকলেন। প্রতিবেশীর পবিত্র কর্তব্য যেমন। আমিও সেই মত কাকীমার পাশে গিয়ে খড়খড়িতে বাধ্য ছেলের মতো নেত্র স্থাপন করলুম। কাকা যতই বারণ করুন, কাকীমা এবং আমি দুজনে একসঙ্গে ওঁৎ পেতে "কুকর্মটি" করছি দেখে দুঃখ পেয়ে কাকাই ঘর থেকে চলে গেলেন।

ওবাড়িতে জানলা খোলা। ঘরে বাতি জ্বলছে। ভাগ্যিস লোড-শেডিং নয়। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দু পাশে দুজন দুই চেয়ারে। একজনের পরনে গামছা ও পৈতে। অন্যজনের মাথায় বড় করে ঘোমটা মুখ দেখা যায় না। শাঁখা রুলি পরা মোটা-সোটা একখানি ফর্সা হাত টেবিলে রাখা, মুঠোতে একটি ফর্দ। অন্য হাতে হাত পাখা। ফিসফিস করে কাকীমা বললেন,

—"ঘরে ফ্যান নেই।"

—"বাজেট মিটিং। প্রত্যেক মাসে হয়।"

জগমোহনবাবুর টিয়াপাখি নাকে নিকেলের গোল গোল হাফ চশমা হাতে হেড এগজামিনারদের মতো মোটকা লালনীল পেন্সিল। ফর্দটা কেড়ে নিয়ে ঘ্যাঁচ করে একটা কী কেটে দিলেন। অমনি ঘোমটার নিচে থেকে বিদ্রোহী জেহাদ ঘোষিত হলো। বপুর তুলনায় অস্বাভাবিক কচি গলাতে।

—"হবে না, হবে না, ইয়ার্কি নাকি? ছেলেমেয়েদের দুধের হিসেবে টাকা কমানো চলবে না—"

—"টাকা নেই।"

—"তবে তোমার নস্যির টাকাটা ছেঁটে দেয়া হোক।"

—"ছেলেমেয়েগুলো তো ধেড়ে-দামড়া হয়ে গেছে এখনো দুধ খাবে কি?"

—"তাহলে কি নস্যি নেবে?"

—"দুধ না খেলেই নস্যি নিতে হবে কেন? চা খাবে।"

—"চায়েও তো দুধ লাগবে।"

—"রুটি দাও। রুটি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। চাইনীজ-জাপানীজ জাতগুলোর বড় হবার পেছনের সিক্রেট কী? ওই রুটি। মাথা পরিষ্কার রাখে।"

—"বেশ, তোমাকে কাল থেকে তাই দেব। আমি কিন্তু বিনা দুধে চা খেতে পারব না।"

—"খেতে হবে—দুধ-চা খাও বলেই অত অম্বল হয়—"ঘ্যাঁচ।" ফর্দ আরেকটা কী যেন কাটা পড়ল।

—"ওকী। ওকী। ওটা যে কেরোসিন? ওগো কেরোসিন বাদ দিলে চলবে কি করে?

কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না, এদিকে লোডশেডিং, সন্ধে থেকেই অন্ধকার—

—"সন্ধে সন্ধে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে সব। রাত্তিরে কোনো কাজ করবে না।"

—"হরির পড়া তৈরি করা আছে—"

—"করতে হবে না। ভোরে উঠে পড়া প্র্যাকটিস করুক। চারটের সময়ে ফর্সা হয়ে যায়। হ্যারিকেন মোটে জ্বালবারই দরকার নেই। চোখের পক্ষে হার্মফুল।"

—"স্টোভ জ্বালবারও কি দরকার নেই? বললুম যে কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"কয়লা নেই কাঠকুটো জ্বালো। স্টোভ জ্বালতে হবে না।"

—"মরণ। অত কাঠকুটোই বা পাব কোন্‌চুলোয়? তোমার কি সুন্দরবনটা ইজারা নেওয়া আছে?"

—"পাড়ার প্রত্যেক বাড়িতে বাগান রয়েছে, গাদা গুচ্ছের গাছ-গাছালি লতাপাতার চোটে বাড়িতে আলোবাতাস বন্ধ, শুকনো পাতার জ্বালায় ঘরে টেকা যায় না.—আর বলছ কিনা কাঠকুটো পাবে কোথায়?"

—"তা কাঠকুটো যে চেয়ে নিয়ে আসবো তারও কি উপায় রেখেছো? পেত্যেকের সঙ্গে তো ঝগড়া। সেদিন এক কলসী জল চাইতে গেছল বড় খুকি ওবাড়ির টিউকল থেকে—ওরা নাকি বলেছে—বাড়িতে আগুন দিয়ে, আবার জল চাইতে আসা হয়েছে। লজ্জাও করে না। আমাদের কেউ ঢুকতে দেবে বাগানে?"

—"তাহলে আর উপায় নেই—রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে আনতে পাঠাও হরিকে—"

—"না। যাবে না হরি। হ্যাঁগো তোমার কি লজ্জা করে না? বাড়িসুদ্ধু লোককে তো চোর করেছো—এবারে পথের ভিকিরিও করবে? রাস্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়োতে যাবে ছেলেটা?"

—"না গেলে গুষ্টির পিণ্ডি রান্না করবে কি দিয়ে?"

—"কয়লা দিয়ে। এবং কেরোসিনের ইস্টোভ জ্বেলে। ও টাকা কমানো চলবে না। ও টাকা আমি কিছুতেই কমাতে দোব না। তুমি তো একটা বদ্ধ উন্মাদ—আমার বাপমা আমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে এর চেয়ে ভালো করতো—একটা ঝি রাখবে না একটা

চাকর রাখবে না—ইসকুল থেকে টেনে বের করে এনে মেয়ে তিনটেকে বিনা কারণে ঘরে বসিয়ে রেখেচো। বিয়ে দেবার নাম নেই, কলেজেও দেবে না—ছেলে-মেয়েগুলো সব ঝি-চাকর হয়ে গেল গো? ঘর মুছতে বাসন মাজতেই দিন যায় তাদের—এখন বলছো রাস্তায় কাগজ কুড়ুনী হতে?—হায় আমার কপাল?”

—“বিয়ে দেবার মতন টাকাটা কোতা? আর কলেজে পড়ে তো কেবল বিবি বনবে। তার চেয়ে এই ভাল।”

—“টাকা নেই? কিপ্টে কোথাকার। টাকা নেই? মোটে একটা মাত্তর ছেলে, সবেধন নীলমণি হরি। সেই ছেলেটাকে পর্যন্ত একটা বাজে ইসকুলে দিয়ে ইহকাল বন্ধ হচ্ছে—”

—“বাজে কেন হবে, চ্যারিটেবল ইনস্টিট্যুশন। অনাথ আতুরদের জন্যে তৈরি—”

—“আমার হরি কি অনাথ? নাকি সে আতুর? তুমিই আসলে একটি ঘোর বজ্জাত—স্যায়না পাগল বুঁচকি আগল—কই, নস্যির টাকার বেলায় তো কক্ষনো বাজেট কমতি হয় না?”

“ওই যে। ওই যে। নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি—” মুখটি উঁচু করে জগমোহনবাবু তখন নস্যি নিচ্ছিলেন, খড়খড়িটা নামিয়ে দিতে দিতে কাকীমা ফিসফিসিয়ে বলেন,

—“এবারে মারামারি হবে। চ উঠে যাই। যত উন্মাদের কাণ্ড।”

—“জগা মারেও?” আমি চোখ কপালে তুলি।

—“জগা নয়। জগার বউ। হাতপাখার বাড়ি দু চার ঘা দেয়। দিয়ে তবে দুধের টাকা, কেরোসিনের টাকা পাস করিয়ে নেয় বাজেটে। এই একই কাণ্ড প্রত্যেকবার। বউটার জন্যে কষ্টও হয়।”

একটু পরেই শোনা গেল দমাদ্দম শব্দ আর—“ও কে, ও কে, দুধ সাঁইতিরিশই রইলো। দুধ সাঁইতিরিশ, পরের আইটেমে চলে এসো।” জগার গলা।

—“পরের আইটেম কেরোসিন।” জগার বউ। তারপরেই আবার ধপাধপ আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গেই জগার স্বর—

—"অলরাইট। অলরাইট। কেরোসিন পাঁচ লিটার। নেকসট আইটেম। নেকসট আইটেম ?"

—"নেকসট আইটেম মেয়ের বিয়ে। ফাগুনে দিলে না, চোত পড়ে গেল। বোশেখ মাসে দিতেই হবে—নইলে—"

ক্লান্ত স্বরে কাকীমা বলেন—"তোর কাকা সত্যি ঠিকই বলেছিল। না শোনাই উচিত। এ আর সহ্য হয় না। চল্ চলে যাই। এবারে জগার পালা। জগা তড়্পাবে, বউটা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে—মেয়েদের জন্যে, সে বড় বিচ্ছিরি"—সত্যি সত্যিই আমরা উঠে গেলুম।

কিন্তু কাকীমার কথা ফললো না। গিন্নির কান্না শোনা গেল না। বাজেট সভার চেঁচামেচিও আর কানে আসছে না। ব্যাপার দেখে কাকা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। মহা দুশ্চিন্তায় পড়া গেল। হলো কী? কাকাসমেত এবার আমরা তিনজনেই খড়খড়িতে ফিরে যাই। গিয়ে দেখি: গিন্নি হাতপাখাটি নাড়তে নাড়তে হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছেন, ঘোমটা তুলে। আর জগমোহনবাবু পা নাচিয়ে নাচিয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বলছেন :—"ওদের বাড়িতে একটা সোন্দরপানা ছেলে দেখলুম আজ! রিকশো থেকেই চেঁচাচ্ছিল—কাকী কাচ ভেঙে ফেললে, কাচ ভেঙে ফেললে! স্যায়না ছোঁড়া!—জামাই করলে মন্দ হয় না!"

॥ পরীক্ষা ॥

সর্বদাই হুহু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন। বন্ধুকে বন্ধু বলে মনে হয় না, শত্রুকে তেমন শত্রু শত্রু লাগে না। মানুষ মাত্রেই সুদূর! মোহমুদ্গরই জগতে একমাত্র সত্য—একটু বদলে নিয়ে, কান্ত



কান্ত কা তে কন্যা কিছুই ভালো লাগে না। মেয়ে.যে কেবলই খেলে বেড়াচ্ছে! ' হয় আগাথা ক্রিস্টি, নয় ব্যাডমিণ্টন, নইলে ঘুম। সারাদিন সারারাত ঘুম। পড়বে কখন? কিছু বলতে গেলেই তার দিম্মা বলেন,—'আহা, ও বড়ো দুর্বল। ঘুমুতে দে। ঘুমতে ঘুমতে প্রিটেস্ট হয়ে গেল।

এই সময়ে চার নম্বর অঙ্কের স্যার চাকরি ছেড়ে দিলেন। এইট থেকে টেনের মধ্যে এই নিয়ে চারবার। অসিতবাবুর পর প্রদীপ। প্রদীপের পর শ্যামলবাবু। শ্যামলবাবু বহু চেষ্টা করেছিলেন। হাফ ইয়ারলির রেজাল্ট বেরুনোর পরই হাসপাতালে গেলেন। পেটে মস্ত বড়ো আলসার। অপারেশনের পরে আবার সাহস করে পড়াতে এলেন, কিন্তু আমিই সাহস পেলুম না। শ্যামলবাবুর পরে অলোকবাবু। অলোকবাবু একদিন টাকাটা খামসুদ্ধ ফেরত দিয়ে বললেন—'ও টাকা আমি আর নিতে পারি না।' আমি তো থ। তিনি সবিনয়ে খাতা খুলে দেখালেন—'এই দেখুন খাতা। এত মাসে একটাও অঙ্ক কষাতে পারিনি। প্রত্যেকটা আমি নিজে কষেছি। নিজে অঙ্ক কষেছি বলে অন্যের কাছে টাকা নেব কেন?' ধরে বেঁধে আধখানা মাত্র নেওয়ানো গেল, বাকিটা টেবিলে রেখে গেলেন।

দেখতে দেখতে টেস্টও হয়ে গেল। স্যার-বিহীনভাবেই। প্রিটেস্টে ইতিহাসে উনতিরিশ ছিল, টেস্টে হল সাতাশ। তার মানে ফাইনালে হওয়া উচিত পঁচিশ, এইরকম নিউমেরিক্যাল প্যাটার্ন অনুযায়ী—মেয়ে জানালো রসিকতা করে—"দুই দুই করে কমছে।"—হাতে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট।

—"কলেজেউঠলে কক্ষনো হিস্ট্রি নেব না; যা ট্রেচারাস সাবজেক্ট!

—"কলেজে ওঠ তো আগে?"

—"সে উঠে যাবো।" র‍্যাকেটের ওপরে শাটলককটা শূন্যে নাচাতে নাচাতে ঊর্ধ্বমুখেই মেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

"উঠে যাবো" বললেই তো হলো না। পড়তে হবে। ইতিহাসের জন্য এক স্যারের বাড়িতে ওকে ধরে নিয়ে গেলো আরাধনা। টিউটর পাই কোথায়? টেস্টের পরে কেউই নতুন ছাত্র নেন না। শেষটায় আমার এক গুণ্ডা বোনপোকে যিনি পড়িয়ে শায়েস্তা করেছেন, পাসটাস করিয়ে কলেজেও গুঁজে দিয়েছেন, তাঁকেই ধরে আনা হলো। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখি সিলেবাসটা।" মেয়ে বললে "দাঁড়ান, ফোন করে জেনে নিচ্ছি। আমার বন্ধুরা জানে।"

—"তুমি জানো না ? লেখা নেই তোমার কাছে ?"

—"ছিল তো,—হারিয়ে ফেলেছি। ফোন করি ?"

—"অঙ্ক বইটা দেখি। কে সি নাগটা। ফোন পরে হবে।"

—"টেস্টের সময়ে স্কুলে ফেলে এসেছিলাম, আর পাইনি।"

—"দেখি, কলমটা আর খাতাটা দাও।"

—"বোন স্কুলে নিয়ে গেছে কলমটা। এই যে খাতা।"

—"বাঃ বাঃ বাঃ। বাড়িতে আর কলম নেই ?"

—"থাকতেও পারে। এই নিন পেনসিল।"

—"এতটুকুনি ? এতো ধরাই যাবে না।"

—"দাঁড়ান, ম্যানেজ করে দিচ্ছি। পেনসিলটাকে এই ঢাকনিতে ফিট করে নিন, ব্যস, তাহলেই ধরা যাবে। এভাবে ছোট পেনসিলও কাজে লাগে।"

—"চমৎকার। একটা জিনিস শিখলুম।" এমন সময়ে চা ডালমুট এলো।

—"এসব কে খাবে ?"

—"আপনার জন্যে।"

—"এ তো বিষ। চা ডালমুট দুটোই লিভার ড্যামেজ করে। আমি ওসব খাই না।"

—"দুধ সন্দেশ খাবেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।"

—"ইয়ার্কি হচ্ছে ?"

—"সে কি ? ইয়ার্কি হবে কেন ? এই তো ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ওটা খাবেন না এটা খাবেন তা তো মা জানেন না ? আগের স্যার চা ডালমুট ভালোবাসতেন।"

নতুন স্যার বললেন, "আপনার মেয়ে তো যত্ন আত্তি খুব করে, বুদ্ধি-শুদ্ধিও আছে। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ। আর আপনিও হয়েছেন যেমন, দিনরাত্তির লেখালিখি পদ্যফদ্য নিয়েই আছেন। অমন মেয়েকে নিজে না পড়ালে হয় ?"

মরমে মরে গিয়ে মনস্থির করলুম। ইংরিজি বাংলা ছাড়া

আমার আর কিছুই পড়ানোর ধৈর্য নেই। তাই বললুম, "বাংলা বইটা নিয়ে আয়।"

—"টাকা দাও।"

—"টাকা কেন?"

—"বই তো দোকানে।"

—"এটাও হারিয়েছিস?"

—"হারাবো কেন? কেনাই হয়নি এ বছরে।"

—"হয়েছিল না?"

—"সে তো নাইনে কিনে দিয়েছিলে।"

—"সেটাই তো টেনের টেক্সট।"

—"নাইনের বই টেনে থাকে? তুমি যে কী!"

বই কিনে এনে ফোন।

—হ্যালো, আরাধনা? বাংলার সিলেবাসটা কী রে? মা জিজ্ঞেস করছেন হ্যাঁ, মার সঙ্গেই কথা বল।

খানিক পর—হ্যালো ভাস্কর? ·অঙ্কের পুরো সিলেবাসটা কী রে?

—"আরাধনাকেই তো জিজ্ঞেস করতে পারতিস। দুবার দুটো ফোন করবার কী দরকার ছিল?"

—"সে তুমি বুঝবে না। আরাধনা কী ভাবতো? আমি কোনো সিলেবাসই জানি না মনে করতো।"

—"সে তো জানিসই না।"

—"জানতুম তো। এখন না হয় ভুলে গেছি। দু বছর ধরে কখনো মনে থাকে? মা, তুমিই বলো?"

পড়ানো চলছে। এপ্রিলে পরীক্ষা। আমার এক প্রিয় ছাত্রীকে টিউটর রাখলুম ফেব্রুয়ারী মাসে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়িয়ে দিতে। একটা ছোট ভাই ফিজিওলজির ভালো ছাত্র ছিল। তাকে বললুম বায়োলজিটা দেখিয়ে দিতে। ছাত্রীটির সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেল মেয়ের। আড্ডা, গল্পের বই এক্সচেঞ্জ, পরচর্চা। একটু একটু পড়াও

দিব্যি চলতে লাগলো ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু এই মামা বেচারীর সঙ্গে তার পিঠোপিঠির মতো সম্পর্ক—নিত্যই যুদ্ধ।

বই নিয়ে বসাই হলো না। দুপক্ষ থেকেই অনবরত নালিশ। তবে দীপু মামা বাঁশীটা বাজায় ভালো। বায়োলজি শেখা না হোক, টেস্টের পরই মেয়ে "এ আর এমন কি" বলে হঠাৎ আড়বাঁশী বাজানো রপ্ত করে ফেললো। দিবারাত্রি বাঁশী বাজছে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে। নীরোর বেহালার মতো। কিছু বললেই বলে,—একটু রিল্যাক্স করছে।"

ইতিমধ্যে একদিন একটি বাউল আমার কাছে তার দোতারাটি বিক্রি করে গেল একশো টাকায়। আর যাবে কোথায়। কোথায় অঙ্ক, কোথায় ইতিহাস—দোতারা নিয়ে পড়লেন মেয়ে। দুদিনের মধ্যেই বাউলের দোতারাতে "হোয়্যার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন লং টাইম পাসিং" বাজতে লাগলো। ঠিক গীটারের স্টাইলে! সঙ্গে ছোট বোন গান গাইতে লাগলো। এবং মামার বাঁশী। সুন্দর একটা ফ্যামিলি কনসার্ট গ্রুপ তৈরী হয়ে গেল। অগত্যা দোতারা এবং বাঁশী নিয়ে মূর্তিমতী শিল্পশত্রুর মতো আলমারিতে তালাচাবী দিয়ে রাখলুম।

মেয়ে খুব সিভিলাইজড, নিয়মিত তিনখানা কাগজ পড়ে। ইন্দিরা, মোরারজী, চরণ বিষয়ে গভীর জ্ঞানী। ভুট্টোকে নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। পরীক্ষার দিন সকালে বিশেষত টেস্টের সময়ে রেগুলারলি দেখেছি। ইদানীং দেখেছি খবরের কাগজ খুলে শিস দিতে দিতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।—যাক, তবু পরীক্ষার ভাবনাটা মাথায় ঢুকেছে। এমন সময়ে মেয়ে একদিন কথা কয়ে উঠলো— আজকাল বেড়ালছানারা আর ছানা নেই মা। ওদের দুধটা কমিয়ে মাছটা বাড়াতে হবে। নইলে ওদের গ্রোথ হবে না ঠিকমতন!"

—"ও তুমি শিস দিতে দিতে বেড়ালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলে? নিজের নয়?"

—"নিজের? নিজের কী চিন্তা?"

—"কোনো চিন্তা নেই?"

—"না, মানে কোন স্পেসিফিক চিন্তাটার কথা বলছ ?"

—"পরীক্ষাটা"—হার মানা গলায় বলি।

—"সে—তো আছে-ই। জানো মা, বন্যা আর বিদ্যুৎ সঙ্কট essay আসছে।"

সেইজন্যে বিদ্যুৎ সঙ্কট নিয়ে গভীর ভাবনা হয়েছে মেয়ের। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা ভাবছে। আলো নিবলেই ভাবতে শুরু করে—সকাল ৯টা পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র ভাবনা। মাঝে শতবার আলো ফিরলেও ডেকে তোলা যায় না।

সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন আমার কাছে। কলকাতার বাইরে একটা সাহিত্য উৎসবে নিয়ে যেতে চান ১লা বৈশাখ। মেয়েরা পাশে এসে যথারীতি বসে আছে। চোখ গোলগোল করে শুনছে—তিনি কত যত্ন করে নিয়ে যাবেন টানা মোটরে, ওখানে কী কী দ্রষ্টব্যস্থান। যেই বললুম—"এখন তো যাওয়া অসম্ভব, পরীক্ষাটা হয়ে যাক,—অমনি মেয়ে বাধা দিয়ে ওঠে—"চল না মা, চল না ? কি সুন্দর। খুব ভালো লাগবে, চল না মা—"

—"আরে ! পরীক্ষা না তখন ?" আমি তো তাজ্জব !

—"কী পরীক্ষা ? ও তখন এম-এ চলবে বুঝি ?" একেবারেই সরল চোখ। অসহ্য রাগ হয় ! রাগ চেপে রাখা আমার স্বভাব নয়। তবু যথাসাধ্য দাঁতে দাঁত চেপে বলি—"কী পরীক্ষা ? জানো না পয়লা বৈশাখ মানে চোদ্দই এপ্রিল। সতেরোই এপ্রিল থেকে কার পরীক্ষা ?"

—"সতেরোই…? ওঃ হো ! স্যরি স্যরি বুঝেছি।" লজ্জায় একগাল হেসে ফেলে বলে "স্কুল ফাইনাল ! আমাদের তো ?"

আমি মরিয়া হয়ে বলি—"এটা মার্চ মাসের সাত তারিখ ? একমাস দশদিন মাত্র বাকী। এখনও জিজ্ঞেস করছো, কার পরীক্ষা মা ? আমি কি বিষ খেয়ে মরব ?"

সভ্যতাভব্যতা বিস্মৃত হয়ে জনসমক্ষে ইতরজনের মতো কাতরে উঠি। বেগতিক দেখে ভদ্রলোক—"আচ্ছা, নমস্কার। এবার তাহলে

থাক। বরং সামনের বছরে—" বলে ছুটে পালিয়ে যান। খুব অপ্রস্তুত মুখে মেয়ে গিয়ে পড়তে বসে। বাঁহাত কুকুরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে। তাতে পড়া ভাল হয়।

লক্ষ্মী এসে নালিশ করে—"বড়দিমণি রোজ রোজ নিজের দুধ আর সন্দেশটা মাস্টারমশাইকে খাইয়ে দিয়ে, নিজে চা ডালমুট খাচ্ছেন।"

—"সে কি কথা?"

—"আমি রোজ দেখতে পাই বড়দিমণি পড়তে পড়তে ডালমুট চিবোচ্ছেন, আর মাস্টারমশাইয়ের গোঁফে সর।"

—অ। কাল থেকে দুজনকেই দুধ-সন্দেশ। চা-ডালমুট মোটে টেবিলে দিবি না।

তিন মাস আমি কোনো নেমন্তন্ন যাই না সভা-সমিতিতে যাই না, লৌকিকতা বন্ধ। মেয়ে এদিকে শনি রবিবার নিয়মিত টিভিতে সিনেমা দেখে, বেস্পতিবার চিত্রমালা দেখে, বন্ধুদের জন্মদিনে কার্ড আঁকে, দীর্ঘ দীর্ঘ ফোন করে। বুকফেয়ারে গেলে সময় নষ্ট হবে বলে আমি সন্ধ্যেবেলায় না গিয়ে দুপুরবেলায় নিয়মরক্ষে ঘুরে এলুম। মেয়ে কিন্তু তিনদিন পরপর মাসিপিসিদের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় রাত দশটা পর্যন্ত বুকফেয়ারে বেড়িয়ে ঘুগনি খেয়ে এল! আমি উদ্বেগে অস্থির। আমার শুভার্থীরা আমার থেকেও বেশী অস্থির। সবাই আমাকে বকছেন। আমার মেয়ের জন্য সবার চিন্তার শেষ নেই।—"কেবল হিল্লিদিল্লি লেকচার মেরে বেড়ালে আর গপ্পোকবিতা লিখলে কারুর ছেলেপুলে মানুষ হয়? কেবল নিজের পড়া আর নিজের লেখা নিয়েই মত্ত। তার ওপরে আজ হাঁপানি, কাল হার্টের রোগ, পরশু হাই প্রেশার, অসময়ে যত ঝামেলা বাধিয়ে তুই-ই বরং ওকে আরো ডিসটার্ব করিস। মেয়েটা পড়বে কখন?"

সবই সত্যি। মেয়েটা সত্যি খুব সেবা করে। অবোলা কুকুর, বেড়াল, রুগ্ন মা, ছেলেমানুষ বোন, বুড়োমানুষ দিম্মা প্রত্যেকের। আবার এও সত্যি যে সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা ওর পেছনেই আছি। ভোরে পাঁচটায় অ্যালাম দিয়ে উঠি। উঠে মেয়েকে

তুলে দিই। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। সাড়ে পাঁচটায় আবার উঠি। আবার মেয়েকে তুলে দিই। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ফাইনালি ৬টায় উঠে চা খেয়ে গায়ে জোর পেয়ে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করি। এবার মেয়ে ওঠেন। গজগজ করতে করতে পড়তে বসেন। আশ্চর্য পড়ে প্রধানত **Test Papers**টা। কেবলই মন দিয়ে প্রশ্নগুলো পড়ে আর হিসেব কষে। তার পড়ার ঘর থেকে টেবিল নামিয়ে এনে আমার ঘরে পেতেছি। দিনরাত প্রশ্ন ধরে আনছি আর টুকছি। প্রশ্ন ধরা মানে মেয়ের বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খাতা চেয়ে আনছি, স্কুলে সাজেস্টেড প্রশ্নগুলো (আমার মেয়ে ওসব টোকে না, যদিও রোজই ক্লাসে উপস্থিত থাকে। শুনতে শুনতে নাকি লিখতে পারে না) টুকে নিচ্ছি। মায়েতে আর ছোটো বোনেতে খাতার পর খাতা ভরে ফেলছে—উত্তর না-জানা প্রশ্নের মালায়।

What is hydro-static paradox ? What is blood ? What is mitosis ? What is Sannvasi Bidroha ? What is K_2 Cr_2O_2 এরপর বই দেখে দেখে উত্তরগুলোও লিখতে হবে। যদি মেয়ে না লেখে। উপায় কি ?

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি বিহারী দত্তকে, তাঁর সেই জাহাজে আমিও ভেসে যাচ্ছি। আমার শুভার্থী বন্ধুরা কী এসব ঘটনা জানেন ? বিহারী দত্তের সমুদ্রযাত্রা ? আমাকে উত্তর লিখতে হয়। আমাকে জানতে হয়

What did the Selfish Giant see ? How was Tenner rewarded ?

আমাকে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বোরিকতুলো, কাঁচি, ডেটল, ব্যাণ্ডেজ আরো পঞ্চাশ রকম টুকিটাকি কিনে আনতে হয়, একটা ভালো দেখে বাক্স যোগাড় করে তাতে ধপধপে কাগজ আঠা আঁটতে হয় তাতে লাল কাগজে রেডক্রস কেটে লাগিয়ে **First aid Box** তৈরী করে দিতে হয়। এই বাক্সের জন্য দশ নম্বর মাত্র বরাদ্দ আমাকে প্রত্যেকটা **Practical** খাতা ভাস্করের খাতা দেখে দেখে

এঁকে দিতে হয়। আমি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলেই কতরকম প্যাটার্ন দেখতে পাই—কক্রোচ-এর এ্যালিমেণ্টারি সিস্টেম, ফ্রগ-এর ইউরিনো-জেনিটাল সিস্টেম—ফীমেলটোড-এর রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম। এত কষ্টের মূল্য নাকি মাত্র ঢু নম্বর। তাছাড়া কিছুদিন হলো মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিতে হচ্ছে। তার হাতটা জ্বলে গেছে। কেননা ওয়ার্ক এডুকেশনে সাবান তৈরি করেছেন তিনি। সে সাবানের সোজা পোর্টেন্সি? একটা কাঠের ট্রেতে রাখা ছিলো। তাতেই ট্রেটাতে ঠিক শ্বেতীর মতো ছোপ ধরে গেছে। এ সাবান কিন্তু গায়ে মাখার জন্যে। নীল, হলুদ, গোলাপী, লোভনীয় স্বপ্নিল প্যাস্টেল রঙে, ফ্রী পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে এখনও গোটা দশেক আছে। চাই?

ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্যে মেয়েরা না হোক আমাদের হোল ফ্যামিলির যেমন ওয়ার্ক তেমনি এডুকেশন হলো। মাটি মাখা, মাটি ছানা মূর্তি গড়া কত কিছু আমি করতে পারি এখনও! সেই মূর্তি থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচটা শিবুই বানিয়ে দিয়েছে অবশ্য। সেই ছাঁচে ফেলে final মূর্তিটা বের করেছে মেয়ে নিজেই। দীপু ওটাকে স্প্রে-পেন্টিং করে দিয়েছে টুথপেস্ট—টুথব্রাশের ছিটে মেরে। ভাস্করের ইনস্ট্রাকশনে। মেয়ে বলছে, "চলবে।"

পিঠে একটা বিশাল নম্বর আঁটা, ওর final পরীক্ষার ছাপানো রোল নম্বর।

—কিরে? হয়ে গেল?

—কথা বোলোনা! সময় নেই! স্কুল পারফরম্যান্স খাতা লাগবে এক্ষুনি—কেউ কি দেখেছো খাতাটা কোথায়?

মেজাজ একেবারে মিলিটারি। যেহেতু সবগুলো খাতায় সযত্নে বাহারী মলাট লাগানো আমারই বৈধ কর্তব্য, আমি তক্ষুনি মনে করতে পারলুম স্কুল পারফরম্যান্স খাতাটা কোথায় দেখেছি—এবং খাতা বগলে "থ্যাংকিউ" বলেই মেয়ে ছুটলো। রিকৃশার পেছন পেছন ছুটতে লাগলো বোনটি এবং মামাটি। রিকৃশা দাঁড়ালো না। বিকেলে ফিরে শুনলুম তারা ছুটতে ছুটতে স্কুল অবধিই গিয়েছিল—"ঢুকেই শুনি ঠিক দিদিরই

রোল নম্বরটা ডাকা হচ্ছে। পি টি পরীক্ষার জন্য। দিদি তক্ষুনি দৌড়োতে দৌড়তে হলে ঢুকে গেল। বগলে খাতা। আমাদের দিকে তাকালোই না।"

—"অমন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কেমন পি টির কায়দা দেখিয়েছে কে জানে।"

পরীক্ষার তিনদিন বাকি। মেয়ে এসে বললে—জানো মা, আরাধনাটা এত অন্যমনস্ক—অ্যাডমিট কার্ডটাই হারিয়ে ফেলেছিলো। অবশ্য এখন খুঁজে পেয়েছে।

—তোরটা আছে তো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আছে। জানো মা, অলকা লাহিড়ীর ব্যাপারটা আরো খারাপ। ধোপার বাড়িতে চলে গিয়েছিলো কুড়মুড়ে হয়ে ফিরে এসেছে। কী হবে ?

—তোরটা কই ? বের কর তো ?

—কী হবে বের করে ? এই তো ড্রয়ারে।

—তবু, একবার দেখানা ?

—এই দ্যাখো বাবা, দ্যাখো !—খুব কনফিডেণ্টলি ড্রয়ার খুলেই মুখ শুকিয়ে এতটুকুনি ! তারপরেই ড্রয়ার তোলপাড় ! তারপর সারা বাড়ি তোলপাড়। মুহূর্তেই প্রবল মাস মোবিলাইজেশন ঘটে যায়। বাড়িশুদ্ধু প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা আনাচ-কানাচ, বাক্স ড্রয়ার, তন্ন তন্ন করে ঘাঁটছে। ঘাঁটতে ঘাঁটতে যে যা খুঁজে পাচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি। ছোট মেয়ে নিল একটা শক্ত ইরেজার আমি পেলুম মর্চেপড়া কাঁচিটা, মা পেলেন একটা জর্দার ডিবে, শিবু পেল স্ক্রু ড্রাইভারটা।—শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের ডাঁই থেকে বেরিয়ে পড়লো মেয়ের অ্যাডমিট কার্ড, আর মায়ের হারিয়ে-যাওয়া মাইনের চেকটা। পরীক্ষার ডামাডোলে খুঁজে পাচ্ছিলুম না, গত মাস থেকেই। কাউকে বলিনি। এখন কে কাকে বকবে ? ডবল কেলেঙ্কারী। আমি দুটোই চটপট আলমারিতে তুলে ফেলি। মেয়েকে যেই বলেছি—"অ্যাডমিট কার্ডটা না পেলে তুই কি করতিস ?" অমনি আমার মা জবাব দেন—"বোর্ডে গিয়ে

তোমাকেই ডুপ্লিকেট নিয়ে আসতে হতো। কিন্তু চেক না পেলে তুমি কী করতে ?"

হোলনাইট প্রোগ্রামগুলো আমাদের মা-মেয়ের এখন যুগলবন্দী হয়ে গেছে। ঠিক লুচিভাজার প্রসেসে কাজ দ্রুত এগুচ্ছে। বেলা, ভাজা, খাওয়া। লুজশীটে আমি একটা একটা প্রশ্নের গরম গরম উত্তর লিখে এগিয়ে দিচ্ছি আর শেষে লুফে নিয়ে একটা একটা প্রশ্নোত্তর কপাকপ গিলে ফেলছে।—হ্যাঁ। এগুলো সব আগেও লিখে দিয়েছিলুম প্রিটেস্টের আগে। টেস্টের আগেও খাতাতেই। কিন্তু সেইসব খাতা এখন আর নেই। জন্মের শোধ কিছু হারিয়ে গেলে আমার মেয়ে বলে—"কোথাও মিসপ্লেসড হয়েছে।" মেয়ের শরীরে উদ্বেগ নেই। সত্যি "স্থিতধী" প্রাণী। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ। মন্দ রেজাল্টেও ভীত নয়, ভাল রেজাল্টেও স্পৃহা নেই।

পরীক্ষার আগের দিন বাড়িতে বিজয়ার মত জনসমাগম—ফোনের পরে ফোনে শুভেচ্ছা আসছে—প্রণাম, মিষ্টান্ন, উপদেশ, স্মৃতিচারণ, অ্যাডভান্স সান্ত্বনা, আগাম সহানুভূতি, ফ্রী। লাস্ট মোমেণ্ট সাজেশ্যনস। পুরো দিনটাই গেল। অত শুভেচ্ছায় শেষ মুহূর্তে মেয়ের অমন লোহার নার্ভও ফেল করলো। মোটা মোটা চশমার কাঁচের পেছনে ভীতু জল চকচক করে উঠলো সদ্য পঞ্চদশী হয়েছেন, ঠিক টেস্টের আগেই। খুবই গ্রোন-আপ ভাবছিলেন নিজেকে। এমন সময়ে দিদ্মা কোলে নিয়ে বললেন—"ভয় কি রে ? তোর মা আরো ফাঁকিবাজ ছিল, ঘাবড়াসনি তুই !"

মেয়ের মন ভালো করতে একটা নতুন ক্লিপবোর্ড কিনে তাতে নাম লিখে দিলুম। ওপরে শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ লিখতে গিয়ে কী রকম একটু লজ্জা করলো। লিখলুম, "জয় বাবা ফেলুনাথ।" ফেলুদের নাথ তিনিই। মা সরস্বতীকে কেন আর কষ্ট দেওয়া ?

পরীক্ষার দিন। ভোর চারটেয় উঠেছি। মেয়েও চারটেয় উঠেছে। আমি এখনও দ্রুত উত্তর লিখছি—কালকের সাজেস্টেড প্রশ্নের। মেয়ে অলস চোখ বোলাচ্ছে, বোরড মুখে। তুমি কার কে তোমার। বোনও

চারটেয় উঠেছে। কলমে কালি ভরছে, পেন্সিল কাটছে, ইরেজার, রুলার মোজা রুমাল এই সব গুছিয়ে রাখছে—জুতো পালিশ করছে, বোতলে জল ভরছে। দিম্মাও চারটেয় উঠেছেন। পরীক্ষার ভাত রেডি হচ্ছে, টিফিন তৈরি হচ্ছে। পোশাক প্রস্তুত। র‍্যাশন কার্ডের খাপ থেকে কার্ড বের করে ফেলে দিয়ে, অ্যাডমিট কার্ড ভরে দিলুম। যাতে ছিঁড়ে না যায়। মেয়ে চান করতে গেল। যেন গায়ে হলুদের সকাল। বাড়িময় এমন তাড়া লেগেছে ভোররাত্তির থেকে। মেয়ের চান হতে হতে মায়েরও চান হয়ে গেল—মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাও গরম গরম ভাত খেয়ে রেডি—পৌঁছুতে যেতে হবে তো? মায়ের গাড়ি যখন-তখন বিগড়ে যায়, তাই বিশ্বস্ত গাড়ি এসে গেছে অনেকক্ষণ, গাড়িতে আরেক-প্রস্ত টিফিন, এবং মামীমা বসে।—কিন্তু মেয়ে কোথায়? রান্নাঘরে। কুকুর-বেড়ালের লাঞ্চ বেড়ে দিতে গেছেন। ধরে এনে দিম্মাকে প্রণাম করাতেই তিনি যাত্রা করার মন্ত্র জপ করে দিলেন নাতনীর মাথায় হাত রেখে। মেয়ে এবার দিম্মাকেও প্রণাম করলো। তার পরেই ছোট বোনকে—"ও কি দিদি? ও কী করছো?" বোনটি কুল-কুলিয়ে হেসে ফেলে।—"ওঃ স্যরি।" গাম্ভীর্য একটুও না হারিয়ে স্থিতধী দিদি বলেন—"লাইনে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? স্টুপিড?" দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, হঠাৎ আমি দৌড়ে আবার ওপরে উঠতে থাকি।

—আবার কোথায় যাচ্ছ মা?

—যাই, মাকে প্রণামটা করে আসি?

—"তুমি?" মেয়ে এবার গাম্ভীর্য হারিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে—"তুমি প্রণাম করবে? তোমার কি পরীক্ষা? পরীক্ষা তো আমার!"

অট্টহাসির রোলের মধ্যে তো দুগ্‌গা বলে রওনা হলুম। গেটে দু-চারজন, বারান্দায় দু-চারজন হাত নাড়তে লাগলো—মেয়ে যেন বিলেত যাচ্ছে।

পরীক্ষার হলে মেয়েকে পৌঁছে দেওয়া আরেক পর্ব। জগৎ পারাবারের তীরে মায়েরা করে খেলা। কিছু কিছু বাবাও আছেন।

আমরাও তো একদিন পরীক্ষা দিয়েছি, মা তো ধারে কাছেও যেতেন না? বন্ধুরা বন্ধুরা মিলে চলে যেতুম, টিফিন বাক্স সঙ্গে নিয়ে।—আজকালকার ছেলেমেয়েরা বেশি বেশি আদুরে হয়েছে। তারা বাপ-মার কথা কম শোনে, আদর-আহ্লাদ তত বেশি পায়। আমাদের কালে টিউটর থাকতেন একজন (যদি অ্যাট অল থাকতেন) এখন প্রতি সাবজেক্টে অন্তত একজন। যেসব ছেলেমেয়েরা একা একা বটানিকসে ডায়মণ্ডহারবারে চলে যেতে পারে, পরীক্ষার হলে তাদেরও কিন্তু প্রত্যেকদিন বাপ-মাকে পৌঁছে দিতে হবে। ফের দুপুরবেলায় অঞ্জলিতে টিফিন নিয়ে মা-বাবারা অফিস কামাই করে হত্যে দেন ইস্কুলের গেটে। বিকেলে ছুটতে ছুটতে পুনরায় হাজির, নীলমণিদের ফেরত নিতে। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক। বাপ-মায়ের এই পুণ্যে যদি বা ছেলেমেয়েরা তরে যায়! যাক, শুরু হয়ে গেল বড় খেলা।

পরের দিন সকালে, আজ অফ ডে। মেয়ে দরজা বন্ধ করে ফোন করছে। আমাদের বাড়িতে এটার চল নেই। আমি তো জোর করে ঢুকবোই ঢুকবো—গোপন ফোন চলবে না চলবে না!—অন্তত ষোলো বছর তো হোক? মেয়ে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়ে ফোনে ফিরে গেল।

—আছে? কী দেখলি? আছে তো? এই প্লীজ একটু দিয়ে যাবি? আচ্ছা, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। দশটার মধ্যে কেমন? ফোন খতম।

—কী ব্যাপার রে?

—কিচ্ছু না। বায়োলজির বইটা। আরাধনার কাছে ছিল।

—কালই তো ইংরিজি আর বায়োলজি? কবে থেকে তোর বই ওখানে আছে?

—টেস্টের পর থেকেই। আচ্ছা মা, আমাকে তো ও কতোবার কতো খাতা ধার দিয়েছে। দেব না বই?

—এতদিন কী দিয়ে পড়লি?

—কেন খাতা? অন্য অন্য সব বই—কত তো বই আছে।

—কিন্তু ওটাই তো টেক্সট বইটা !

—ও কিছু না ।

তিনদিন পরে ।

—"সকালে ফিজিক্যাল সায়েন্স, বিকেলে সংস্কৃত । এই সংস্কৃত খাতাগুলো টিফিনের সময়ে নিয়ে যেও ঠিক মা !" মনে করিয়ে দিল মেয়ে বেরুনোর সময়ে । গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখলুম ইস্কুলের সামনে আরাধনা ঢুলে ঢুলে সংস্কৃত পড়ছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ।—"ও কি রে ?" আমার মেয়ে যেচে জ্ঞান দিলেন—"এখনই সংস্কৃত পড়ছিস ? এখন যেটা পরীক্ষা সেইটে পড়বি তো ?" আরাধনা অবাক হয়ে তাকায় ।

—"সেইটেই তো পড়ছি । এখন স্যান্সক্রিট না ?"

—"কী ?" আমি বিষম খাই। "এখন স্যান্সক্রিট ? তবে যে বললে এখন ফিজিক্যাল সায়েন্স । সংস্কৃত বিকেলে ?"

—"আবা-র ?" আরাধনা আর্তনাদ করে ওঠে । "আবার তুই টেস্টের মতন করলি ?" আমিও আর্তনাদ জয়েন করি । এবার স্থিতধী কন্যা আমাদের প্রতি সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করেন—"যাগগে মা—ওবেলা না-হয় এবেলায় । কী এসে যায় ? দিনটা তো ঠিকই, স্যান্সক্রিট খাতাপত্তর আর আনতে হবে না ।" স্থিতধী নাচতে নাচতে ভেতরে চলে যান । আমরা ব্যাকুল মা-বাপেরা ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষায় হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি । এমন সময়ে শুনি শূন্য থেকে দৈববাণী হচ্ছে "মা ! মা ! এই দ্যাখো, আমরা কোথায় ?" ভীষণ রোদে ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ উঁচিয়ে দেখতে পাই—ঠাঠা রোদ্দুরে চিলের ছাদে দু-তিনটে ইউনিফরম পরা ঝাঁকড়া চুল মূর্তি—একগাল হাসতে হাসতে হাত নাড়ছে, যেন এভারেস্টের চূড়োয় তেনজিং ইত্যাদি ।

উপসংহার :

এরপর নিশ্চয় স্কোর বোর্ডটা দেখতে চান ? যেমন খেলোয়াড়, যেমন পিচ, তেমনি খেলা ; আর তেমনই রেজাল্ট । হোল ফ্যামিলির অসামান্য টীমওয়ার্কের টোটাল স্কোরিং সাড়ে তিয়াত্তর পার্সেন্ট।

ছটোমাত্র লেটার। তার একটা আবার বায়োলজিতেই। ঘরময় দৌড়ে দৌড়ে ধপাধপ শব্দে একটা বল বাউন্স করতে করতে মেয়ে বলল—

—"মা, তোমাদের সত্তর, আমার সাড়ে তিন—এফটওয়াইজ। দিম্মাকে সেই প্রণামটা তুমি যদি করতে, স্টারই পেয়ে যেতুম নির্ঘাত।"

॥ জীবে দয়া ॥

মা টেরেসা নোবেল পুরস্কার পেয়ে অবধি দেশে জীবে দয়ার ট্রেনিং শুরু হয়েছে। আমাদের এক প্রতিবেশী সেদিন দেখলুম একজন ভিখিরিকে ডেকে এনে ছেঁড়া লুঙ্গি দিচ্ছেন। সেজপিসেমশাই একজোড়া



আস্ত স্যানডাল চটি দিয়ে দিলেন রিকশাওলাকে (গত বছর এক বেচারী চোর ও বাড়িতে চুরি করতে ঢুকে, চটি জোড়া ফেলে পালিয়েছিল)। লতুবৌদি এক খাঁচা বদ্রীপাখি কিনে দিলেন ছেলেকে।—"যা দিনকাল পড়েছে, একটু মায়ামমতা প্র্যাকটিস করুক। প্রাইভেট টিউশন ছাড়া কিছুই তো শেখে না ছেলেপুলেরা, পাখিদের যত্ন করতে করতে যদি জীবে দয়া শেখে।"

জীবে দয়া করে যদি ক'লাখ টাকা ঘরে আসে, তো আসুক না, ক্ষতি কি? জীবে-দয়ার যে এতটা আর্নিং পোটেনশিয়ালস আছে তা কি আগে জানা ছিল? যেমন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পরে কবিতার আর্নিং ক্যাপাসিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে গেল, আর গাদা গাদা ইংরাজি কবিতা লেখা হতে লাগলো।

কিন্তু আমাদের বাড়ির ব্যাপার স্যাপার আলাদা। এ বাড়িতে প্রচণ্ডরকম জীবে দয়ার ট্র্যাডিশন—আমার মেয়েরা অষ্টবক্র মুনির মত জীবে দয়ার ট্রেনিং সমেত ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাদের দয়ামায়ার অত্যাচারে বাড়িসুদ্ধু অতিষ্ঠ। কিছু বলতে গেলেই আমার মা বলেন, "বোঝো এখন নিজে আমার কষ্টটা! মা যেমন, মেয়েরা তেমনিই হয়েছে।" এর ফলে তাদের জীবে-দয়া বাধাবন্ধহারা হয়ে আরও দিগ্বিদিকে ধাবিত হয়। দিকের চেয়ে বিদিকেই বেশি। ওদের বুকে জীবে দয়া যত বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসারের অশান্তিও চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যাচ্ছে।—অথচ, মুশকিল এই যে, সংসারটাকে আমার কিছুতেই খুব সীরিয়াস ব্যাপার বলে মনে হয় না। মার সংসার ছিল আসল সংসার। আমারটা যেন খেলাঘর। সেই বাড়িঘর, সেই মা, সেই আমি, এবং আমার মেয়েরা—এবং গাদা গাদা পুষ্যি (যেমন আমারও ছিল)—নেই কেবল বাবা। বাবা ছিলেন—মায়ের সংসারের মাথা ছিল। আমার খেলার সংসারে কোনো মাথা নেই, তাই সংসার নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই। যেন রান্নাবাড়ি খেলছি—ঘরকন্নাটাকে কিছুতেই আমার বাস্তব বলে আর বিশ্বাস হতে চায় না। এ-সংসার যেন ভবসংসার—এর কাণ্ডারী সত্যি করে তিনিই, যিনি এই অখণ্ড মণ্ডলাকার

ব্রহ্মাণ্ডটিকে চালাচ্ছেন। আমার সংসারে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা আছে দ্বার।

ছেলেবেলায় আমি যখন কানাখোঁড়া, কুকুর বেড়াল, ডানাভাঙা পাখি, বাসাভাঙা কাঠবেড়ালী, কাকের ছানা, এমনকি চামচিকে পর্যন্ত ধরে এনেছি—মা কখনো কখনো সইতেন, কখনো গুনিয়াভাইকে দিয়ে পগারপারে ভাগিয়ে দিতেন। আমি পারি না। ফলে আমার সংসারে জীবজন্তু আসে, আসে, আসে। এবং থাকে, থাকে, থাকে। আমাদের নিজেদের যত কৌটো চাল লাগে, কুকুর বেড়ালদের চাল লাগে তার চেয়ে বেশি। নিজেরা মাছমাংস খাই না-খাই—কুকুরের হাড়, বেড়ালের মাছ চাই-ই।

মা মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহ করেন। যখন অতিথিরা এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, সবগুলো কোচের গদিতে এক একটা আদুরে বেড়াল রোঁয়া ফুলিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। ঠেললেও ওঠে না। 'এহ বাহ্য!' টুল মোড়া, মাদুর পেতে অতিথিদের বসাই। যাবার সময়ে তাঁদের অনেক সময়ে খালি পায়ে যেতে হয়। জুতোগুলি এ বাড়ির কুকুর ইতিমধ্যে চিবিয়ে রেখেছে। কেউ কেউ খালি পায়ে যেতে রাজী হন না, আমাদের জুতো পায়ে দিয়ে যান। প্রত্যেকটি পর্দা, চাদর, টেবিলক্লথ চিবোনো, ঝুল্লি ঝুলছে। প্রত্যেক চেয়ার টেবিল আলমারির পায়া চিবোনো এবড়ো খেবড়ো। প্রত্যেকটি চেয়ারের সমস্ত চামড়ার গদি ছিন্নভিন্ন, তুলো বেরুনো—ওতে বেড়ালরা নখে শান দেয়। সর্বত্র ওডোনিল ঝুলছে, প্রত্যেকটি ঘরেই তাজা, ফ্রেশ স্যানিটারি সুবাস। যেমন দামী হোটেলের বাথরুমে। (নইলে মনে হবে চিড়িয়াখানা)।

মা দুঃখে হাসেন। হাসবেন না? তিনি যখন গিন্নি ছিলেন, তখন সংসারে লক্ষ্মীশ্রী ছিল। জীবে দয়া করতে-করতে কী বাড়ি কী হয়ে গেল লণ্ডভণ্ড।

কিন্তু এহেন বাড়িতে আরো জীবে দয়া করা সম্ভব। সেই স্কোপ এখনও আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঘটনাটা শুনুন, বিশ্বাস হবে।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলছে। সন্ধেবেলায় হঠাৎ রাস্তায় একটা

গণ্ডগোল। পড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মেয়েরা তো জানলায়। একটু পরে ছোট এসে বলল—"মা! মা! শিগগির এসো! একটা কুকুরছানাকে না, (কী সু-ঈ-ট, ছো-ওট্টো, এখনও চোখই ফোটেনি ভালো করে) দুষ্টু ছেলেগুলো ঢিল মারছে, পা দিয়ে লাথি মেরে বল খেলছে, এমন মাড়িয়ে দিয়েছে যে পেছনের দুটো পা কেমন লম্বা হয়ে গেছে!" এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সাংসারিক ভূমিকা কী হওয়া উচিত ছিল কে জানে, আমি তো আবাল্যের অভ্যেসে লাফিয়ে উঠেছি—

—"কই? কই? কোথায়? চল্ তো দেখি—"

—"দিদি ওদের বকে দিয়েছে। ছেলেরা পালিয়ে গেছে।"

—"আর কুকুরছানাটা?"

—"দিদির কোলে।"

—"আর দিদি?"

—"গেটে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আনবে কি?"

মুহূর্তেই বুঝে ফেলি ব্যাপার। ঢোকেনি যখন, তখন নিশ্চয় সে গৃহে প্রবেশের যোগ্য নয়। সেবারে যখন কাকে ঠুকরে একচোখ গলে-যাওয়া, পেছনের পা-প্যারালাইজড্ বেড়ালছানাটাকে এনে ওরা শোবার ঘরে খাটে শুইয়ে পরিচর্যা করেছিল, আমার মা কুরুক্ষেত্র করেছিলেন। এবারে তাই সাবধানতা নিয়েছে মেয়ে। মুহূর্তেই আমার কর্তব্য স্থির।—"খবরদার ভেতরে আনা হবে না। ওই সামনে, সদর উঠোনে যে-কোণটায় একটু ঢাকা মতন আছে, সেখানে রেখে দাও।"—"রাখি? থ্যাংকিউ! থ্যাংকিউ! মা, তুমি সত্যি খুব ভালো।" তারপরেই ছুটোছুটি।—"মা একটু দুধ? একটা সসার? বোরিক তুলো? ডেটল?"

আমি তো জীবনে মাকে থ্যাংকিউ বলেছি বলে মনে পড়ে না যদিও শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার মায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা। এরা বলছে, বলুক। বলতে বলতেই কৃতজ্ঞতা আসে হয়তো আজকাল।

রাত্রে খেতে বসে আলোচনা হচ্ছে দুই বোনে। দিদি বলছে—"ফ্রিজের দুধ দিসনি, একটু গরম করে দে, নইলে কিন্তু খাবে না।"

—"একটু মাংসের স্টু দেব, দিদি? তুলোর পল্‌তেয় করে?"

—"ও ভীষণ উইক, ঠিক কুকুরের মত ডাকতেও পারে না মা, বেড়ালছানার মত ডাকে।"

—"বেড়ালছানাই নয় তো?" মা ফোড়ন কাটেন।

—"কী যে বল দিমা। আস্ত কুকুর। দিই স্টু?"

—"পাগলা!" বড়মেয়ে বলে "স্টু দেয় না। চোখই ফোটেনি, নুন খাওয়ালে মরে যাবে। বরং এক ফোঁটা ভিটামিন ড্রপ দিতে পারিস।"

—"খবর্দার এখন ভিটামিন দিস না।" মা হাঁ হাঁ করে ওঠেন—"সর্বনাশ হবে, পেটের অসুখ করবে যে। সদর উঠোন একেবারে নষ্ট করে ফেলবে।" তারপরেই যথানিয়মে—"আর তোমাকেও বলিহারি যাই খুকু। মেয়ে দুটোকে কী নষ্টই করছিস। অ্যানুয়াল পরীক্ষার মধ্যে পড়াশুনো ছেড়ে উঠে গিয়ে ঐসব নোংরা জিনিস ঘাঁটছে—ছি ছি!—"

—"মাদার টেরেসা তো কুষ্ঠরুগী ঘাঁটেন।" বড় মেয়ে উত্তর দেয়। ছোটমেয়ে সগর্বে বলে,—"দিদি তো বড় হয়ে মাদার টেরেসা হবে। না দিদি।"

—"আর তুমি? সিস্টার নিবেদিতা?"

—"আমি? লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প!" এ বছরে ওদের টেক্সটে আছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। ঝুপ করে আলো নিবে গেল। সারমেয়-জননী ব্যাকুল।

—"ওমা দশটা বেজে গেল যে? এক্ষুনি ওকে দুধ খাওয়াতে হবে। চার ঘণ্টা হয়ে গেছে।"

—"হোক গে, অন্ধকারে নিচে যেতে হবে না।"

—"অন্ধকার তো কী? আমি টর্চ ধরে থাকবো।"

লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প জবাব দেন। টেরেসা জুনিয়র দুধ, তুলো, টর্চ নিয়ে রেডি। শুশ্রূষাপার্টি লোডশেডিং উপেক্ষা করে সদরে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন গেল চঞ্চলা আর লক্ষ্মী। যেন গায়ে হলুদের

তত্ত্ব যাচ্ছে। ওরা যাচ্ছে পাহারাদার হয়ে। খোঁড়া কুকুরছানাকে কোলে তুলে অতি যত্নে দুধ খাইয়ে, ওপরে এসে ডেটলে হাত পা ধুয়ে সে-পোশাক বদল করে, দুই দয়াবতী পড়তে বসলেন। মোমবাতি জ্বেলে। এগারটায় আলো ফিরবে।

আজকাল বাড়িতে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়া। অ্যানুয়াল পরীক্ষা বলে কথা। রাত্রে খাবার পরেও পড়তে বসা হয়। পৌনে বারোটার সময়ে মা তাড়া লাগাতে শুরু করেন—"বারোটা বেজে গেছে, উঠে পড়। আর পড়তে হবে না।" অবশেষে সাড়ে বারোটায় তাঁরা উঠে ফ্রিজ খুললেন।

—"মা, দুধ ?" মা টেরেসার প্রশ্নের উত্তর দিই,—"আজ সকালে দু' বোতল দুধ কেটে গেছে। যা ছিল তোমার দশটার ফীডেই খতম।"

—"দুধ নেই ? তা হলে কী খাবে ও ?"

—"কিছু ভাবিস না। ঠিক হয়ে যাবে।" বোনকে সান্ত্বনা দেয় দিদি।—"দেশলাই আছে ? দীপুমামা ?" ঘুমন্ত দীপুমামাকে ঠেলা মেরে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

—"যা যা ; ঝামেলা করিস না। এত রাত্তিরে দেশলাই দিয়ে কী হবে ? কারেন্ট এসে গেছে।"

—"গ্যাস জ্বালবো।"

—"গ্যাস ?" দীপুমামার একটা চোখ খুলে যায়। "কেন রে ? চা হচ্ছে বুঝি ?" দেশলাই বেরিয়ে পড়েছে বালিশের নিচে থেকে।

—"চা না। দিদি জল গরম করবে, নিউট্রামূল গুলবে।"

—"কে খাবে, নিউট্রামূল ? এত গুডগার্ল কে হয়েছে ?"

—"কেউ না। কুকুরছানা।"

—"এই মাঝরাত্তিরে নিউট্রামূল খাবে ব্যাটা কুকুরছানা ? দে আমার দেশলাই ফেরৎ দে !"

—"খিদে পায় না তার ? সেই দশটায় খেয়েছে।"

—"ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবে নাকি ? হোলনাইট প্রোগ্রাম ? তার

চেয়ে ওকে চা করে খাওয়া না বাপু? চা খুব নিউট্রিশাস ড্রিংক। আমিও একটু খেতুম।"

—"দুধ নেই।"

—"যাব্বাবা।"

রাতবিরেতে গ্যাস জ্বেলে জল গরম হয়। কাচের গেলাসে প্রচণ্ড সিরিয়াসলি চামচ নেড়ে ঠনঠনাঠন্ মহাশব্দ করে পাড়া জাগিয়ে নিউট্রামূল তৈরি হতে থাকে। সব ঘরে আলো জ্বলছে। যেন বিয়ে-বাড়ি। সবাই সজাগ, কাজের লোকেরাই কেবল যা নিদ্রাবিহ্বল। দুই মেয়ের সেবাসুন্দর মাতৃমূর্তি দেখলেও চোখ জুড়োয়। মধ্যরাত্রে কী প্রবল ব্যস্ততা। দীপুমামা বলেছে, "তুলোয় করে কত খাওয়াবি? ড্রপারে করে তাড়াতাড়ি খাবে।" তাই কালি ভরবার একমাত্র প্লাস্টিকের ড্রপারটি গরমজলে ধুয়ে ধুয়ে নিষ্কলুষ তথা স্টেরিলাইজ করা হচ্ছে। পরিষ্কার ড্রপারে টাটকা নিউট্রামূল নিয়ে হাতের উল্টোপিঠে ফোঁটা ফোঁটা ফেলে পরীক্ষা করা হচ্ছে, উষ্ণতা ঠিক সারমেয়শাবকের নরম জীবের যোগ্য কিনা। বড় মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে আঁতুড়ঘরের ডিউটিতে এক্সপার্ট নার্স। বোনটি একটু কম এক্সপার্ট। আয়া। ইনস্ট্রাকশন ফলো করে সে দিদির।

—"চল্। সব রেডি? পোশাকটা বদলেছিস তো?"

—"কিন্তু এখন রাত্তির একটা। এত রাত্রে আমরা একা একা সদরের উঠোনে বেরুবো?" বোনের প্রশ্ন।

—"দীপুমামাকে ডাক।"

—"নো। নেভার।" দীপুমামা গর্জন করে। "চা করবার বেলায় পারলি না। আমি যেতে পারব না। একা একাই যা। ওখানে জ্যোতিবাবুর পুলিশরা বেড়াচ্ছে। ওরা দেখবেখ'ন।"

—"ঠিক আছে। চল্‌রে, আমরা যাই।"

—"কি হচ্ছে কি! তোমাদের মার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? কুকুরছানা না খেয়ে থাকে থাকুক।" হায়ার অথরিটি থেকে ইনজাংশন জারী হয়ে যায়।

—"দীপুমামা, প্লীজ ওঠো, মা যাবেন না, দিম্মা বকছেন—" অগত্যা দীপু ওঠে।—"হয়েছেও বাবা এক আজব বাড়ি! রাত্তির দুটোর সময়ে, দুটো বাচ্চা মেয়ের চোখে ঘুম নেই। কী? না—রাস্তায় কুকুর খাওয়াবে!—চল্ চল্।" আর যাবে কোথায়! দীপুর গজগজানি থেকে শুরু হয়ে গেল মার লেকচার।—"খুকুরই আহ্লাদ দেবার কুফল এসব। তুমি ছেলেপুলে মানুষ করতে জানো না, খুকু! আমি দুড়দাড় করে পালিয়ে যাই, যাবার আগে বন্যার মুখে খড়কুটো ধরার মতো আউড়ে নিই—"রাত্তির একটা বেজে গেছে, মা—এটা কি বকুনি দেবার সময়?"

মাকে যুক্তিতে বাগ মানাবো তুচ্ছ আমি? ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে?

—"যদি দুটো কচি মেয়ের পক্ষে, এই শীতের রাত্তিরে, মাথায় হিম ঝরিয়ে, সদর রাস্তায় হটর্ হটর্ করে বেরিয়ে গিয়ে পথের নেড়িকুকুরের রুগ্‌ণ ছানা নিয়ে খেলাধুলো করবার পক্ষে সময়টা উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদের গার্জেনকে বকবার পক্ষেই বা এটা সুসময় নয় কেন?"

আমি বারান্দায় পালাই। উঁকি মেরে দেখি বড় মেয়ে পাঁচিলের ধারে বসেছে সিঁড়িতে। কুকুরছানা কোলে করে দুধের বদলে মধ্য-রাত্রের অমূল্য ভালোবাসা গুলে, ড্রপারে করে খাওয়াচ্ছে। কোলে একটি ন্যাপকিন পেতে নিয়েছে। ওই ন্যাপকিনটা ফেলে দিতে হবে।

ছোট কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হুকুমের অপেক্ষায়। রকের ওপরে একটা সিগারেট জ্বলছে। অর্থাৎ দীপুমামাটি সেখানে। পাহারা দিচ্ছে আর জ্ঞানের বাণী উচ্চারণ করছে।

—"ওটার গায়ে গ্যামাক্সিন পাউডার দিয়েছিস তো? দিসনি? এবার ভ্যাখ্ কি সর্বনাশ হয়। তোদের মাথায় রাস্তার কুকুরের পোকা চড়ে বসবে, সেই পোকা এসে উঠবে বাড়ির অন্য কুকুর বেড়ালের গায়ে। তখন ঠেলা বুঝবি।"

—"যা তো টুমপুস, সেভিন পাউডারটা নিয়ে আয়! প্লীজ। কী সর্বনাশ।"

—"কোথায় আছে? এখন তো অনেক রাত্তির।"

—"এখন তবে থাক কাল সকালে দিলেই হবে।" দীপু বলে।

—"বাঃ! ততক্ষণে যদি আমাদের মাথায়—"

দীপুমামা ফের সলিউশান দেয়।—"ওপরে গিয়ে বরং তোরা মাথায় সেভিন-পাউডার মেখে শো। সকালে শ্যাম্পু করে নিবি।"

—"সকালবেলায় তো পরীক্ষা। কখন মাথা ঘষবো?"

আমি বারান্দা থেকেই স্থানকাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠি—"খবর্দার! সেভিন দিবি না মাথায়। মানুষের মাথায় কখনো কুকুর বেড়ালের পোকা হয়? অ্যাদ্দিন জীবজন্তু পুষছিস, এও জানিস না?"

এমন সময়ে টহলরত দুটি পুলিশ এসে দাঁড়ায় পাঁচিলের পাশে। উঁকি দিয়ে দেখে এত রাত্রে কী অঘটন ঘটছে এ বাড়ির উঠোনে। কুকুরসেবা দেখে একজন পুলিশ সস্নেহে জিজ্ঞেস করে—"মর্ গিয়া?" ব্যাস্ দুই বোনে একসঙ্গে বকুনি লাগায়—" কিঁউ মরেগা? দুধ পীতা দেখতা নেই?" ছোট যোগ করে দেয়—"ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতা হ্যায়, দেখতা নেই?" পুলিশরা হেসে বলে যায়—"আবতক্ জিন্দা হ্যায়? তাজ্জবকি বাত্!"

এমন সময়ে ছোট মেয়ে ওপরে মুখ তুলে বলে—"মা! একটা সোয়েটার দাও শিগ্‌গির।"

—"কেন রে? শীত করছে?"

—"আমি না কুকুরছানার জন্যে। ও শীতে কাঁপছে।" পেছন পেছন দীপুমামার ফোড়ন—

—"ও রাইগর জগতের কোনো সোয়েটারে থামাতে পারবে না। ও হল মরবার আগের কাঁপুনি।"

গুম্ গুম্ করে কিলের শব্দ এবং দীপুমামার গলায় 'বাপ্‌রে মারে'। তারপরে দেখি মেয়ে ওপরে চলে এসেছে—হাতে নিজের ছোট্টবেলার একটা লাল-নীল সোয়েটার নিয়ে নেমে যাচ্ছে। ওরই পুতুলখেলার বস্তু।—"এটা নিচ্ছি?"

—"নে! কিন্তু সোয়েটার তো ওকে পরাতে পারবি না। ওর আসলে শীত করছে ঠাণ্ডা সিমেন্টের মেঝেয় শুয়ে আছে বলে।"

—"পাপোশটা নিয়ে নেবো তাহলে, গেট থেকে?"

—"মোটেই নেবে না পাপোশ"—ও ঘর থেকে মা বাধা দেন। ফাইনাল গলায়। জীবে দয়ার কারণে বাড়িসুদ্ধু সবাই জাগ্রত। সব দরজা খোলা। সব আলো জ্বালা।

—"তবে কী নেবো?"

—"গোটা কয়েক স্টেটসম্যান আর আনন্দবাজার ভাঁজ করে বিছানা পেতে দে। দিব্যি গরম হবে।"

—"ওই সোয়েটার পরা কুকুরছানাটাকেই কাল ইস্কুলে পাঠিয়ে দিস খুকু। তোর মেয়েদের পরীক্ষাগুলো দিয়ে-টিয়ে আসবে!" মা বলেন।

একটু পরে, ফের ডেটলে হাত-পা ধুয়ে, শোবার পোশাকে, কোলের কাছে শুয়ে বড়টি বললো—"কাল ওকে তুমি বন্দেল রোডের ভাল ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবে, মা? ওর পেছনের পা দুটোতে সেই বেড়ালছানার মতন প্যারালিসিস না হয়ে যায়—ভেঙেই গেছে মনে হচ্ছে।"

—"হবে হবে। এখন তো ঘুমো।"

সকালে উঠে নেজাল ড্রপের ড্রপারটা দিয়েই মেয়ের কলমে কালি ভরে দিলুম। পুনরায় সাড়ম্বর কুকুর-পরিচর্যার পর্ব সমাধা করে, তাঁরা পরীক্ষায় বেরুলেন।—"জিওমেট্রি বক্স যে পড়ে রইল—" আমি পেছন পেছন ছুটি। নির্বিকারভাবে ফিরে এসে জিওমেট্রি বক্স নিয়ে ছুটতে ছুটতে জীবে দয়াবতী রিকশায় ওঠেন গিয়ে। যেন এটাই নিয়ম।

—"আমি দেড়টায় এসে ফের খাওয়াবো।"

—"দুগ্গা দুগ্গা! ভাল করে লিখিস।"

সেদিনই আমার ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে ফিরতে রাস্তার আলো জ্বলে গেল। বাড়ির সামনে এসে দেখি এক নাটকীয় দৃশ্য! পাঁচিলের ওপরে একটি দীর্ঘ মোম জ্বলছে তার পাশে গেটে হেলান

দিয়ে একজন, পাঁচিলে কনুই ভর রেখে একজন, মাথা নত করে অ্যাটেনশন হয়ে মিলিটারি কনডোলেন্সের স্টাইলে আর একজন—একটি মৌন মিছিল স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। দেখেই বুঝেছি কী হয়েছে। —দীপুই দৌড়ে আসে।

—"দিদি, সর্বনাশ হয়েছে। সেই ছানাটা—"

—"মরে গেছে তো? যাবেই, জানতুম।"

—"ও কি? অমন করে বলতে হয়? বাচ্চাদের খুব মন খারাপ—"

—"মা, এখনই গাড়ি তুলো না। একটু গঙ্গার ধারে যেতে হবে"—বড় বলে।

—"কিংবা পার্ক স্ট্রীটের সেমিট্রিতে"—ছোট বলে।

আমি সিধে গাড়ি গ্যারেজে তুলে দিই।

—"ওকি? যাবে না?"

—"ওই কুকুর নিয়ে? পেট্রল কে দেবে?" উঠোনের সেই কোণটাতে গিয়ে দেখি সিঁড়ির ওপরে একটি জুতোর বাক্সে স্প্যানের কাগজ বিছিয়ে শবশয্যা প্রস্তুত। ছোট্ট কফিন। কিছু ফুলদানি থেকে তোলা রজনীগন্ধার মঞ্জরী তার পাশে, আর চন্দনধূপ জ্বলছে। একগাদা খবরের কাগজের বুকে, মোমবাতির রহস্যময় মৃদু উদ্ভাসে, স্বয়ং একটি শোক সংবাদের মতো নিজেই নিজের অবিচুয়ারি হয়ে শুয়ে আছে ছোট্ট, অতীব খুদে একটি প্রাণহীন প্রাণী। তার গায়ে আমার মেয়ের রংচঙে সোয়েটার। খুব মায়া হয়। কিন্তু হতকুচ্ছিত। একেই ওরা বলেছিল "সুইট?" কেমন জামাই পছন্দ করে আনবে কে জানে? মোমবাতি, ধূপ, ফুল, কফিন সব রইল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে কাগজগুলোর তুপাশে ধরে স্ট্রেচারের মতো তুলে ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে নামিয়ে দিলুম রাস্তায়, নর্দমাতে। ঠিক নাকবরাবর টুল পেতে বসে তুজন পুলিশ আমার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গেটের বিপরীতেই এটা ঘটছে। মুদ্দোফরাসীতে মনে হোলো আমার এতই নৈপুণ্য যেন এই কর্মই করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনভর বুঝি মড়া ফেলতে ফেলতে রপ্ত হয়ে গেছে কাজটা।

ওপরে এসে গা ধুয়ে কাপড় বদলে চা খেতে বসেছি, মেয়ে বললে— "ও কি ওখানেই থাকবে ?"

—"তা কেন ? ভোরবেলা জমাদার এলে নিয়ে যাবে। মন খারাপ করিস না, ও বাঁচত না রে।"

—"বাঁচলেও তো হাঁটতে পারত না, সে ভীষণ কষ্টের বাঁচা হত। ছানাটা মরে বেঁচেছে।" মা সান্ত্বনা দেন। মেয়েরা কিছুই বলে না! চুপচাপ পড়তে বসে। ফের পরশুদিন পরীক্ষা। বেড়ালগুলো গিয়ে ওদের পড়ার বইয়ের ওপর চড়ে বসে। ওরা সরিয়ে দেয় না।

—"কই জমাদার তো নেয়নি, মা ?"—সকালে উঠেই উঁকি মেরেছে।—"কিন্তু খবরের কাগজগুলো নেই।"

—"ঠিক চারটের সময়ে ঝাঁটার শব্দ পেয়েছি।" মা বলেন। "খবরের কাগজগুলো তখনই নিয়ে গেছে নিশ্চয়।" যে-গেট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি বেরুবে, লালনীল সোয়েটার পরা কুকুরছানা নর্দমায় শুয়ে রইল তার সামনেই। যেন দোলনায় ঘুমুচ্ছে।—"এতগুলি গণ্য-মান্য পুলিশের সামনেও ফেলে গেল ? ধন্যি পৌরকর্মী !"

—"দশটার আগেই ক্লিয়ার করে দেবে, ভাবিস না"—দীপুমামার টিপ্পনী।—"চীফ মিনিস্টার বেরুবেন তো।"

দশটায় জ্যোতিবাবু যাত্রা করলেন। উঁকি মেরে দীপু বলল—

—"নেই। নিয়ে গেছে। যা বলেছিলুম।"

—"নেয়নি। ওই তো, সরিয়ে রেখেছে কেবল—"

—"এই তো ফুটপাতে, ঘাসের ওপরে—"

—"এই তো আমাদের বাড়ির গায়েই—"

—"এই তো আমাদের গেটের ধারেই—"

—"কত মাছি এসেছে, ঈশশ।"

মাছি ? শকুন নয় তো ? যাক বাঁচা গেল। ঐ সোয়েটারের দৌলতেই কিনা জানি না—এখনো যে কাক চিল শকুনিরা টের পায়নি তবুও রক্ষে।

ছোট বলে—"এখন কী হবে, ওখানেই থাকবে ?"

বড় বলে—"তখনই বললুম গাড়ি তুলো না—শুনলে না তো—"

—"দ্যাখ, জীবে দয়া ভালো। কিন্তু আমিও তো একটা জীব? সারা দিনের শেষে ফেরবামাত্র ওপরে উঠতে দেবে না, মরা কুকুর সৎকার করতে নিয়ে যেতে হবে? ভোর থেকে উঠে তোমাদের খাবার তৈরি, জামা ইস্ত্রি, কলমে কালি ভরা, জিওমেট্রি বক্স নিয়ে পেছু পেছু ছোটা—আমাকে তোরা পেয়েছিস কী?"

বকুনি খেয়ে মেয়েরা করুণ মুখে চুপ করে থাকে। তখন আবার বলতে হয়—"দেখি ওই জুতোর বাক্সটা কোথায়? এখন তো তা হলে গাড়িটা বের করতেই হয়—"

—"ওই কুকুরের বাসি মড়া কি এখন ফুলের মালা দিয়ে গাড়িতে তোলা হবে?" মা বলেন।

"তা ছাড়া আর উপায় কী?"

"উপায় করপোরেশনে খবর দেওয়া।"

মা আমার সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ। কত কিছু জানেন। রাস্তায় কুকুর মরে পড়ে থাকলে কী করতে হয় তা জগতে কজনে জানে? আমার মা জানেন।

—"দি করপোরেশন অফ ক্যালকাটা, হেলথ ডিপার্টমেণ্ট ডিরেক্টরি খুঁজে বের করে নে। ঠিকানা দিয়ে বল, মুদ্দোফরাস পাঠাবে। অরডিনারি জমাদারে মড়া ফ্যালে না, ওদের ওটা কাজ নয়।"

খুব সোজা ব্যাপার। মাত্র সাতবারের চেষ্টাতেই টু-থ্রি এক্সচেঞ্জ পাওয়া গেল। দুই মেয়ে হাঁটুতে চিবুক রেখে স্থির বসে আছে। উদ্বিগ্ন মাতৃমূর্তি। মা টেরেসা জুনিয়র। অ্যাণ্ড অ্যাসিস্টাণ্ট! অনেকক্ষণ ফোন বেজে গেল, বেজে গেল। তারপর একজন ধরলেন। মনে হল না, নামানুযায়ী ইনিই হেলথ অফিসার।

—"কুত্তা মর গয়া? কাঁহা? জ্যোতি বসুকা ঘরকা সামনে? কওন জ্যোতি?"

ওহো, চীফ মিনিস্টর? ঠিক ঠিক আভী সাফাই হো জায়গা। ইয়ে

সেণ্ট্রাল অফিস হ্যায়—আপ ডিস্ট্রিক ক' অফিসমে ফোন কীজিয়ে—ফাইভ সিক্স্।

—"লিখেনে, লিখেনে, শিগ্‌গির—"

একমেয়ে কলম এগিয়ে দেয় অন্য মেয়ে হাতের পাতায় চট্‌পট্‌ লিখে নেয় ফাইভ সিক্স।

—ডিস্ট্রিক্ট:'ক' অফিস, টালা ব্রিজকো পাসমে বরানগর ও হী এরিয়া হ্যায়।"

—বরানগর যেন বলল? ভাবতে ভাবতে ফোন করি।

—হ্যালো 'ক' হেলথ অফিস? আজ্ঞে চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে একটা কুকুরছানা কাল থেকে মরে পড়ে আছে।

—তা এখানে কেন? জ্যোতিবাবু কি এখানে থাকেন? বরানগর তাঁর কনস্টট্যুয়েন্সি, তাঁর রেসিডেন্স নয়। এও জানেন না? এমন লোক এখনো আছে এ শহরে?

—আজ্ঞে? তা তো জানিই—আমি তাঁর বাড়ির সামনে থেকেই বলছি তো। হিন্দুস্থান পার্ক থেকে।

—তা এখানে কেন? এটা তো কাশীপুর—

—কিন্তু আমাকে তো করপোরেশন থেকে এই নম্বরই···

—আঃ হা—তাতে কি হয়েছে? মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। ভুল করেছে। আপনি ফোন করুন ডিস্ট্রিক্ট 'খ'তে। ফোর টু···। এটা ভুল পাড়া। বুঝেছেন তো?

—লিখে নে, লিখে নে, ফোর টু···ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। খুব বুঝেছি।

—হ্যালো। ফোর টু···?

—হ্যাঁ, বলুন।

—চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে একটা মরা কুকুরছানা পড়ে আছে। দয়া করে যদি—

—চীফ মিনিস্টারের বাড়ি? অর্থাৎ হিন্দুস্থান পার্কে? ওখানে একটা কুকুরছানা মরেছে?

—ভীষণ মাছি উড়ছে—হেলথ হ্যাজার্ড···

—বুঝেছি বুঝেছি। খুব মুশকিলের কথা। কিন্তু এটা তো ডিস্ট্রিক্ট 'খ'র অফিস। আমরা কী করতে পারি বলুন ?

—আজ্ঞে দয়া করে যদি একটু সরিয়ে নেন—

—তা তো বুঝছি, মুশকিলটা কী জানেন, আপনারা তো আমাদের অফিসের আনডারে পড়েন না ?

—পড়ি না ? আমরা ডিস্ট্রিক্ট 'খ' নই ? তবে আমরা কী ?

—উদ্বেগের কিছু নেই। আপনি বরং ডিস্ট্রিক্ট 'গ'র অফিসে, ফোর ফাইভ···এ ফোন করুন। ওরা পারবে।

—লিখে নে ! লিখে নে ! ফোর ফাইভ ··মেয়ের হাতের খুদে চেটো উপচে পড়ে এখন কনুইয়ের কাছাকাছি লেখা হচ্ছে ফোন নম্বরের তালিকা।

—ফোর ফাইভ···এ ফোন করব তো ?

—হ্যাঁ। করে ডিসিওকে চাইবেন। শুনুন, শুনচেন, যাকে-তাকে বললে দেরি হবে, সোজা ডিসিওকে চাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কিছু মনে করবেন না এটা তো ভুল অফিস—মানে, আপনারা ভুল এরিয়া—বুঝেছেন।

—থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। লিখে নে, ডিসিও—বুঝেছি, আমরা ভুল এরিয়া।

—হ্যালো ! ফোর ফাইভ···? ডিস্ট্রিক্ট 'গ'র হেলথ অফিস ?

—ইয়েস।

—সিডিও আছেন ? সিডিও ?

—কে ? কাকে চাইছেন ?

(নেপথ্যে এদিকে মেয়েদের চীৎকার)—

—সিডিও নয় মা ! সিডিও নয় ! ডি সি ও। বল, ডি সি ও। এই যে, লেখা আছে—

—স্যরি ! সি ডি ও নয়, ডি সি ও ! উনি আছেন ? ডি সি ও?

(নেপথ্যে ফোনের ভেতরে আকুল প্রশ্নোত্তর শোনা যায়। "ডিসিওকে চাইছে। কী বলব ? আছে, না নেই ?"

—"আমি কি জানি? দেখে আয়। থাকলে বলবি আছে, না থাকলে বলবি নেই।"

—এই রকম বলব ত?

—আবার অন্য রকম কী বলবি? তুই সত্যি যাচ্ছেতাই—

ইতিমধ্যে আর একজন ফোন ধরলেন—হ্যালো। কাকে চাই আপনার?

—ডিসিওকে।

—কেন? কী দরকার?

চীফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনের উল্টোদিকের ফুটপাতে একটা কুকুরছানা মরে পড়ে আছে।

—অ। তা আমাকে বলে কি হবে? ডিসিওকে বলুন।

—তাঁকেই তো চাইছিলুম।

—একটু ধরুন—

—হ্যালো। হ্যালো! শুনছেন?

—আবার কী হলো?

—আচ্ছা, ডিসিও মানে কী, বলতে পারেন?

—তাও জানেন না? আচ্ছা লোক তো? ডিস্ট্রিক্ট কনজারভেটরি অফিসার। ডি সি ও। বুঝেছেন? আপনারা ওসব বুঝবেন না, এই নিন কথা বলুন।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, কনজারভেটরি? না কনজারভেন্সি?

—ফের ঝামেলা? ওই একই হলো। ধরুন—

—হ্যালো! ডিসিও বলছেন? নমস্কার। নমস্কার। আমি বলছি হিন্দুস্থান পার্ক থেকে। (তখন চীফ মিনিস্টার ইত্যাদি···)

—ওঃ। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কুকুরছানা মরেছে? ঠিক আছে। কিছু ভাববেন না। এক ঘণ্টার মধ্যে ক্লিয়ার করিয়ে দিচ্ছি।"

—ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।

—কী আশ্চর্য, ধন্যবাদের কি আছে। এ তো আমাদের ডিউটি। এখুনি লোক যাচ্ছে।

ফোন নামাতেই মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়লো।

—কেন তুমি সিডিও বলছিলে?

—কিসের ইনিশিয়ালস তা না জানলে আমার অমন অক্ষর মনে থাকে না।—বিডিও এস ডি ও-র মতই সিডিও বলেছি। বেশ করেছি।

—ওরা তোমাকে কী ভাবলো?

—আমাকে চেনেই না। তা ছাড়া আমি মরলে তো ওদের খবর দিলে চলবে না, হিন্দু সৎকার সমিতির নম্বরটা ফোনের খাতায় লিখে রেখে যাবো। যাও তো এক কাপ চা করে আনো দেখি। বাপস রে! এর থেকে গাড়িতে নিয়ে গেলেই হতো।

—বলেছিলুম তো। এই বেলা বারোটায় চা?

—কেন? রাত দুটোয় নিউট্রামূল তৈরি করতে পারো—

—রাত দুটো নয়। একটা। ছোট মেয়ে শুধরে দেয়।

—আর অসময়ে খাওয়াবার ফলটাও তো চোখে দেখলে! বড় মেয়ে মন্তব্য করে।

—তোমাদের যত এনার্জি সব জীবজন্তুদের বেলায়—আমি কিছু বললে হাত পা নড়ে না—

—ছি ছি মা তুমি কুকুরছানাটাকে হিংসে করছো?

—তা করছি। আমি যখন বুড়ো হবো, তখন তোমাদের এই মনগুলো কোথায় চলে যাবে কে জানে?

—দিম্মা তো বুড়ো হয়েছেন। তোমার মনটা কি কোথাও চলে গেছে? এতক্ষণ ফোন করল কে?

এমন সময়ে ওপর থেকে মার গলা পেলুম—"খুকু! মেয়েদের নিয়ে ওপরে আয় দিকিনি এই মুহূর্তে। মুসম্বির রসগুলো পড়ে পড়ে তেতো হতে লাগলো—বেলা বারোটা বাজে! ভোর থেকে কেবল একটা মরা কুকুর নিয়ে নেত্য করছিস? আমি তো একটা বুড়ো মানুষ, আমার প্রতি কি তোদের দয়ামায়া হয় না রে?"

হুড়মুড়িয়ে ওপরে ছুটি পাল্লা দিয়ে তিনজনে—মা ক্ষেপে গেলে সর্বনাশ, জীবে দয়া বেরিয়ে যাবে প্রত্যেকের।